তপঃভূমির অমৃতধারায়

নীলমাধব গঙ্গোপাধ্যায়

রঞ্জনা বুক হাউস
মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলী

প্রকাশক :
শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
রঞ্জনা বুক হাউস
রিষড়া, হুগলী

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৮

ব্লক নির্মাণ :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
কলিকাতা

ছেপেছেন :
কুইক প্রিণ্টারস।

প্রচ্ছদপট অঙ্কন :
শ্রীসুনীলরঞ্জন রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরামেশ্বর মিত্র
তারামা প্রিণ্টিং
১২/১এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

স্বর্গত পিতৃদেব

আকুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্মরণে

নিবেদন

পুজোর আগে অথবা বিয়ের আগে হয় অধিবাস। আজকাল আবার কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে, কোন মন্ত্রী মহোদয়কে দিয়ে হয় উদ্বোধন অথবা দ্বারোদ্ঘাটন। চিঠির উপরে থাকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ। তেমনি বইয়ের প্রথমে থাকে ভূমিকা। এটা একটা প্রথা। এটা না হলে মানায় না। যেমন কনের বিয়ের সময় পড়াতে হবে বেনারসী। অতএব এটা দিতে হবে। আমি বলি ভাল। লেখকের একটা বিনীত Application থাকা দরকার। থাকা দরকার একটা কৈফিয়ৎ। নতুবা পরে অনুতাপ করতে হতে পারে। বিশেষ করে যারা অখ্যাত, অজ্ঞাতকুলশীল, নাম গোত্রহীন।

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সারস্বত সমাজে, যারা বরণীয়, যারা স্মরণীয়, যারা অধিরূঢ়, তাদের সভার প্রবেশ দ্বারে অধিজানু, অধোবদনে, নাম গোত্রহীন আমি এক নূতন। "কোন মতে একধারে স্থান করি লব।" দিওনা ফিরায়ে মোরে।

হরিদ্বার, ঋষিকেশ, লছমন ঝুলা, আরো উপরে এগিয়ে ধরাসু, উত্তর কাশী ইত্যাদি থেকে শুরু করে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, গোমুখ এমন কি ত্রিশূল প্রভৃতি স্থানের উপরে লেখা অনেক রত্ন জমা পড়েছে সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারে। তাদের মধ্যে অনেক পড়েছি। অনেকেই পড়িনি। হয়ত যা পড়িনি, তা আরও মূল্যবান। তা হলেও যাদের লেখা আমায় আকৃষ্ট করেছে, উৎসাহীত করেছে বেশী, এই মুহূর্তে তাদের আশীর্বাদ আমার সব চাইতে বেশী প্রয়োজন। আজ আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি সুসাহিত্যিক মান্যবর প্রবোধ কুমার সান্যাল, মান্যবর শঙ্কুমহারাজ, মান্যবর অবধূত কে। হিমালয়ের উপরে এদের লেখা আজ আমাকে নিয়ে এসেছে এই পথে। এদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি মাত্র। দাবী করিনা কোন স্বকীয় বৈশিষ্ট। রাম নাম যতই নেওয়া যায় ততই ভাল। তবে বলতে ইচ্ছে হয় ডরি না কাহারে আমি আমি একলব্য। অর্জুন নহিকো আমি। গুরুমোর আছে দ্রোণাচার্য্য। তাই আমার এই তিন দ্রোণাচার্য্যকে জানাই নমস্কার।

আমি দুধ থেকে ছানা কেটে খাবার চেষ্টা করিনি। চেষ্টা করেছি দুধ পান করতে। পথে চলতে গিয়ে যে সব সাদামাটা চরিত্রগুলির সাথে হয়েছে সাক্ষাৎ, তাদের নাম, ধাম, একটু আধটুক রদবদল করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি মাত্র। এই বই লিখতে গিয়ে তাড়া খেয়ে তাড়াহুড়ার মধ্যেই সাজ করতে হয়েছে। বিপর্যয়, প্রমাদ, ভুলকে এড়াতে পারিনি। তাই পাঠকবর্গের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, চিঠির দ্বারা আমার ভুল ভ্রান্তি ধরিয়ে দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

চেষ্টা করেছি যা দেখেছি তা লেখবার, যা শুনেছি তা বলবার। তবুও অনেক দেখা কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে লিখতে পারলম না। অনেক শোনা বলতে পারলাম না। যা দেখেছি তার চাইতে অদেখা রয়েছে বেশী। যা শুনেছি, তার চাইতে অশ্রুত রয়েছে অনেক।

এই বইখানি লিখতে গিয়ে যাদের কাছ থেকে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি, তাঁদের নাম স্মরণে না আনলে কৃতঘ্ন বলে গণ্য হব। এঁদের মধ্যে আমার অগ্রজ শ্রীকমলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীদেবপ্রসাদ বসু, বন্ধুবর শ্রীপার্থসারথী গুর, এবং মান্যবর শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অন্যতম।

এ স্থলে একটা কথা উল্লেখ না করে পারছিনা। বইটির নাম করতে ব্যাকরণের প্রথা অনুসারে হওয়া উচিত ছিল—'তপোভূমির অমৃতধারায়'। আমি সে স্থলে 'তপঃভূমির অমৃতধারার' নাম রাখাতে হয়ত বিদগ্ধ সমাজ ব্যাকরণের যুক্তি তর্ক তুলতে পারেন। প্রথমেই আমার ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি।

প্রুফ্ দেখার সময়ের অভাবে মুদ্রণ প্রমাদও ঘটেছে কোন কোন স্থলে। ২য় সংস্করণে শুধরে নেবার বাসনা রইল।

সবশেষে বলি এই বইয়ের পাঠক বর্গ যদি এই বই পড়ে কিছুমাত্র আনন্দ বা উপকার লাভ করেন, তবে আমার শ্রম সফল হল বলে মনে করব।

ইতি
বিনীত
নীল মাধব গঙ্গোপাধ্যায়

॥ এক ॥

যখনি পথ হাত-ছানি দিয়ে ডেকেছে—বেড়িয়ে পড়েছি তার ডাকে। অজানা টেনে নিয়ে গেছে—দূর হতে দূরে, পথ থেকে পথে, গ্রাম থেকে গ্রামে। শহর থেকে শহরে। পাহাড় থেকে পাহাড়ে। কত নদী, কত বন, কত মানুষ, কত তাদের বিচিত্র মন। সব মিলিয়ে মিশিয়ে এক মহাবিস্ময়। এক মহা সৃষ্টি। অপূর্ব, অদ্ভুত তুমি ভারত। তুমি মহাভারত। তুমি মহাবিস্ময়। তোমাকে প্রণাম। লহ মোর ভক্তি অর্ঘ্য। লহ মোর কোটি নমস্কার।

এ মহাভারত ভূমিতে রচিত হয়েছে যুগ থেকে যুগে কত ইতিহাস। কালের করাল আঘাতে সরে গেছে তারা একের পর এক। মনের মানস পটে আজ তারা কিছু ছায়া, কিছু বা রহস্য। কিছু বা ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। তবু তাদের স্মরণ করি। তাদের মনে রাখতে ভাল লাগে। তাদের বিচরণ ক্ষেত্রে, তাদের কথা মনে রেখে চলতে বড় ভাল লাগে। এ এক নেশা। এ নেশা যাকে পেয়েছে—সে বোধ হয় গৃহ ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। গৃহের টান আর তাকে টানে না। বেঁধে রাখতে পারে না তাকে চারটি দেয়ালের মায়া। একেই কি বলে বৈরাগ্য?

গঙ্গা, পতিত পাবনী গঙ্গা। কেবল মাত্র উত্তর ভারতের নয়, সমগ্র আর্যাবর্তের প্রাণস্বরূপিণী গঙ্গা। কত পরিবর্তনের সাক্ষী গঙ্গা। যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালে, কত জাতি এসেছে। গড়ে উঠেছে তাদের সভ্যতার ইতিহাস। কত মহামানব এসেছেন। গঙ্গার তীরে রেখে গেছেন তাদের পদচিহ্ন। গঙ্গা কত মানুষের সুখের কাহিনী শুনেছে। শুনেছে দুঃখের গান। গঙ্গা কিন্তু থামেনি কোন দিন, বিরাম-বিহীন চলেছে তার কলতান।

এই মুহূর্তে উত্তর কাশীর গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাল লাগছে। সূর্য বসেছে পাটে। অন্ধকারের ছায়া নেমে এসেছে গঙ্গার বুকে। ভাবতে ভাল লাগছে সেদিনের কথা।—এই মাতা গঙ্গা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রের ঐরাবতকে। মহাদেবের জটার আবর্তে পড়ে ঘুরে ঘুরে অবশেষে পুত্র ভগীরথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেবলোক থেকে নেমে এসেছিলেন মাতা। তার পুণ্যবারি স্পর্শে ধন্য হয়েছিল তপোলোক। নরলোকে এসেছিল প্রাণের জোয়ার, উদ্ধার হয়েছিল সগরবংশ।

ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হিমালয়—দেবাত্মা হিমালয়—মনে হয় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন মহাভারতের দিকে। 'ধ্যান-গম্ভীর ঐ যে ভূধর'-এর আহ্বানে

এসেছিলেন শংকরাচার্য, এসেছিলেন বিবেকানন্দ। ভারতের মানুষ চিরকাল ঋণী হিমালয়ের কাছে। হিমালয়ের আকর্ষণ দুর্নিবার আকর্ষণ। এ আকর্ষণের টানে আমিও বেড়িয়ে এসেছি পথে। গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে হিমালয়ের প্রবল আকর্ষণে, উত্তর কাশীর বেগবতী গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে, ভুলে গেছি এই মুহূর্তে ঐ নরলোকের কথা। অথচ ওখানেই কাটিয়েছি আমার সবগুলি বসন্ত। মন টানে আরো উপরে, আরো দূরে। ঐ অজানা দুহ'াত দিয়ে ডাকছে। কত যুগ যুগ ধরে ডেকেছে আমায়। গঙ্গা আমার প্রাণ! হিমালয় আমার আত্মা।

আজ এক পাশে আমার গঙ্গা, আরেক পাশে হিমালয়। হে গিরিরাজ, তুমি আমায় নিয়ে চল। এসো তো মাতা গঙ্গা, তোমার রেখা ধরে চলে যাই অমৃতলোকে, দেবাদিদেবের পদমূলে। এই উত্তর কাশী, তপোভূমি উত্তর কাশী। এখানেই রয়েছে বারণাবতের যতুগৃহ। পঞ্চপাণ্ডব আর মাতা কুন্তি দেবীকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করেছিল কূটচক্রী দুর্যোধন। সুরঙ্গ কেটে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বেঁচেছিলেন তাঁরা। এবং আবার এখান থেকেই একদিন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন স্বর্গারোহণের পথে। যথাসময়ে বলবো সে কথা। এখন বলি হরিদ্বারের কথা। সাধনভূমি হরিদ্বার।

দেখার নেশা, জানার নেশা, ঘোরার নেশা, এক এক জনের এক এক রকম। হরিদ্বারের কালি কমলির ধরমশালার ছাদে বসে এক নেপালী ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হচ্ছিল। কেউ আসে তীর্থ করতে, কেউ আসে দেশ দেখতে। আবার কেউ আসে নিছক কয়েকটা দিন বাঁধা-ধরা ছকের বাইরে এসে আনন্দ উপভোগ করতে। আমাদের নেপালী ভদ্রলোক এসেছেন দেশও দেখবেন, তীর্থ-ধর্মটাও সেরে ফেলবেন সেই সাথে। অর্থাৎ রথ দেখাও হবে কলা বেচাও হবে।

আমাদের চোখের সামনে মনসা পাহাড়। পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকে চলে গেছে হরিদ্বার থেকে দেরাদুন পর্যন্ত রেললাইন। মাঝে একটু ঘুরে হৃষিকেশ, লছমন ঝুলা। ভদ্রলোক বলছিলেন অনেক গল্প। বাংলাভাষা একটু একটু বুঝতে পারেন। কিন্তু বলতে পারেন না। হিন্দী মোটামুটি বলতে পারেন। হিন্দী এবং ইংরেজীতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে বলছিলেন অনেক গল্প। ভদ্রলোকের সাথে রয়েছেন তার বাবা, মা, স্ত্রী, ভাই-বোন এবং তাদের নিকটতম প্রতিবেশী। ভারত দর্শনে বেড়িয়েছেন।

আমার একটা ভুল ধারণা ছিল প্রথমে। নেপালে যারা বাস করে তারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। তার পরেই মনে পড়ে গেল—পৃথিবীর বুকে একটি মাত্রই হিন্দু রাষ্ট্র আছে। তা হচ্ছে নেপাল। যদিও ছোট। যদিও পৃথিবীর মানচিত্র থেকে খুঁজে নিতে হয়। তা হলেও মনে হয়, এ যেন এক নারীর কপালে সিঁদুরের বিন্দু।

আলাপ করে মনে হল ভদ্রলোক একটু বেশী বাঙালী প্রিয়। প্রশ্ন করতেই বললেন "নেপালের গায়ে বাঙলা। নেপাল রয়েছে উঁচুতে। সমভূমিতে নামলেই বাঙলা। বাঙলার কালচার তাকে প্রভাবিত করে বেশী। বহু বাঙালী প্রতি বৎসর যায় কাঠমাণ্ডু। পশুপতিনাথকে দর্শন করে নিজেকে ধন্য মনে করে বহু হিন্দু তীর্থযাত্রী।" গল্পের ছলে বললেন তিনি—"প্রথমে পশুপতিনাথকে, দর্শন করে তবেই কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, ইত্যাদি দর্শন করা উচিৎ।"

মনে মনে একটু হাসলাম। কথাটা ঠিক কি না জানি না। যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে বলব পঞ্চ কেদারের কে বড়, কে ছোট তা নিয়ে চুল-চেরা বিচার করতে বসা ভুল। সবই তীর্থ। সবই দুর্গম। সবই রম্যস্থান। ভদ্রলোক সৌজন্যের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন নিজের জন্মভূমির শ্রেষ্ঠত্ব। এটা কোন দোষের নয়। কে না চায় তার নিজের জন্মভূমির গৌরবের কথা শোনাতে। ভদ্রলোকের উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

বার বার 'ভদ্রলোক, ভদ্রলোক' বলছি তার কারণ আছে। উনি আমাকে তখন নামটা বললেও আজ আমি ভুলে গেছি। যতদূর মনে পড়ে শেষের দিকে 'রাণা' কথাটা উল্লেখ করেছিলেন। তাই এবার থেকে আমি 'রাণাবাবু' বলেই উল্লেখ করছি। রাণাবাবু সপরিবারে আজই কেদারবদ্রী দর্শন করে ফিরেছেন। দেখলাম সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে হরিদ্বারের বুকে। গরমটাও বেশ পড়েছে। তাই ঝির ঝিরে হাওয়ায়, চাঁদের আলোতে পরিশ্রান্ত মনে বেশ ভালই লাগছিল। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তবুও ভাবছি রাণাবাবুর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করি।

আমি প্রশ্ন করলাম—'আপনারা এখান থেকে যাবেন কোথায়? রাণাবাবু একটা হাই তুলে উত্তর দিলেন—আজ রাতটা বিশ্রাম নিয়ে কালই সকালে দিল্লী যাব।

আমি আসার পথে আগ্রা হয়ে এসেছি। শুনেছি আগ্রাকে গরমে টেক্কা দেয় ভারতের রাজধানী দিল্লী। তাই আঁতকে উঠে বললাম—দিল্লী যাবেন? দিল্লীতে তো এখন প্রচণ্ড গরম।

রাণাবাবু একটু হাসলেন। বললেন—গরম হলেও যেতে হবে। আমরা বেরিয়েছি ভারত পর্যটনে। মহাভারতের দেশ দেখব। মানবরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দেখব। আমার বাবা-মায়ের অন্ততঃ তাই ইচ্ছা। গরমের কথা বলছেন। পথের কষ্টকে তো স্বীকার করে নিতেই হবে। আজ যে আমরা কেদার বদ্রী থেকে ছয় দিন বাদে ফিরলাম? গরম না পেলেও কষ্ট তো পেয়েছি?

আজকাল বদ্রীনারায়ণ পর্যন্ত বাস যায়। যাত্রীদের মূল মন্দিরের কাছেই নামিয়ে

দেয়। কিন্তু কেদার নাথের মন্দির অবধি বাস যায় না। অনেকটা আগেই বাস থেকে নেমে যাত্রীদের হেঁটে যেতে হয়। রাস্তা তৈরি হচ্ছে। হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই মূল মন্দির পর্যন্ত বাস যেতে পারবে। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রীর কথা জানি না। অতদূর পর্যন্ত বাস রাস্তা হবে কি না খোঁজ করিনি। কারণ ভাল লাগেনি।

পায়ে হেঁটে যাওয়া আর বাসে চড়ে যাবার মধ্যে একটা মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। অন্ততঃ আমার কাছে। আমি মনে করি, পায়ে হেঁটে যাবার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ রয়েছে। অনেক কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায়। প্রকৃতির শোভা উপভোগ করা যায় স্বাধীন ভাবে। যতটুকু পার হেঁটে চলো। না পার থেমে যাও। বিশ্রাম নাও। আর প্রকৃতির শোভা, অপরূপ রূপ লাবণ্য, নয়ন সার্থক করে দেখে নাও। সব ক্লান্তি সব বিষাদ, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। চোখ দুটিকে যতদূর পার ছড়িয়ে দিয়ে শুধু ভেবে চল। আর গ্রহণ কর। তোমার না পাওয়া ক্ষীণ মন, পেয়ে আবার গঙ্গার স্ফীত-ধারার ন্যায় নেচে উঠবে। উঠে আবার চল। দূর হতে দূরে। আরও দূরে।' দেবাদিদেবের পদমূলে, যেখানে গঙ্গা লুকিয়ে আছে অনন্ত পাহাড়ের জটার মধ্যে। অবশেষে গোমুখ থেকে বেরিয়ে এসে, হেসে, হেসে, নেচে, নেচে, চলেছেন সাগর-সঙ্গমে।

গোমুখ থেকে আরো এগিয়ে গেলে ত্রিশূল। গোটা এ চত্বরটাতেই বসুধা তার অপরূপ শোভা সাজিয়ে রেখেছেন থরে বিথরে। ভাবলে অবাক হই সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টি দেখে। মনটা ভরে উঠে অপূর্ব ভক্তি রসে। এ যে সত্য! এ যে শান্ত! এযে সুন্দর!

'সত্যম্ শিবম্‌-সুন্দরম্'

এ যে পরম শান্তি! বলতে ইচ্ছে করে—'এস তুমি। তুমি এস; তোমার সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে ভরিয়ে দাও আমার মন। আর দুহাত তুলে জানাই আমার কোটি কোটি নমস্কার। নিবেদন করি আমার অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা। তোমার আলোকে আলোকিত কর আমার গহন অন্ধকারে ডোবা অন্তরের অন্তঃস্থল।

হে সুন্দর! হে ভারত আত্মা! হে মহাত্মা হিমালয়! কি অপরূপ রূপের আঁধার তুমি। এখানে বসেই যেন বলতে ভাল লাগে—

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।"

বৃঃ আঃ ১।৩।২৮

চিন্তাধারা ছিন্ন হয়ে যায় রাণাবাবুর কথায়।

—আপনি মহাভারত পড়েছেন?

হঠাৎ এধরণের প্রশ্নে কিছুটা হকচকিয়ে যাই। বিরক্তি বোধ করি মনে মনে। মনে পরে স্বামী বিবেকানন্দের কথা। কোথায় কখন কি ভাবে বলেছিলেন তা হয়ত এই মুহূর্ত্তে মনে পড়ছে না। তবে তার ভাবার্থ হচ্ছে এই—

অনেক ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক কে প্রশ্ন করলে, তারা পৃথিবীর রাজনৈতিক খবরা খবর বলে দেবেন। কিন্তু ধর্মের খবর অনেকেই তারা রাখেন না। অথচ ভারতের বহু শিশুকে প্রশ্ন করলে তারা রামায়ন মহাভারতের গল্প শুনিয়ে দেবে।

ইউরোপীয় কালচারের একটা দিক হচ্ছে দৈহিক জ্বালা, দৈহিক ক্ষুধানিবৃত্তি। ইহোলোকের শান্তি। ভারত চায় আত্মার শান্তি। ফলে দুটি সমাজ ব্যবস্থা দুটি ভিন্ন গতি নিয়েছে। তাই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা আর ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটা মস্ত বড় পার্থক্য সহজেই নজরে পরে।

ওরা চায় ঘরকে ছেঁটে কেটে ছোট করতে। আমরা চাই ঘরকে আরো বড় করতে। গ্রামের মানুষ যৌথ পরিবারে বাস করে। এমন দৃষ্টান্ত আজও বিরল নয় আমাদের দেশে। আমাদের বিবাহ প্রথার মধ্যে দেখা যায় সমাজের খবরদারী। বিবাহ মানেই বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, গ্রাম বাসী দেখাশুনা, পূজা যজ্ঞ ইত্যাদি সহকারে এক হুলু-স্থুলু কাণ্ড। বড় কনে এখানে একমাত্র প্রধান নয়। তাই আনন্দ পাই। সকলে আনন্দ লাভ করে। আমরা মনে করি দুটি পরিবার দুটি শক্তি। দুটি নর ও নারী সেতু বন্ধনের দ্বারা একত্রিত হচ্ছে। এ যেন দুট নদী। মহা মিলনের আনন্দে দুদিক থেকে, দুদেশ থেকে ধেয়ে এসে সঙ্গমে মিলিত হচ্ছে। দুটি হাতকে মিলিত করে বন্ধন যুক্ত করে দিচ্ছেন দুই কুলের পুরোহিত। নীচে থাকছে জলপূর্ণ ঘট। যজ্ঞের লাল অগ্নি শিখা পূর্বের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত বিঘ্ন, সমস্ত পাপকে দাহ করে আগত নব জন্মের অঙ্গিকারে জলছে। হে আমাদের পূর্ব পুরুষ গন। তোমরা এস। তোমরা সাক্ষী থেক। তোমাদের অমর আত্মা শান্তি লাভ করুক। হে দেবতা গন। আপনারা আসুন। আশীর্বাদ করুন নবজন্মের দুটি নর নারীকে। আশীর্বাদ করুন দুটি কুলকে। অগ্নি মন্ত্রে উচ্চারিত হচ্ছে ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি। উচ্চারিত হচ্ছে বৈদিক মন্ত্র—

ওঁ মধুবাতা ধাতায়তে মধুঃক্ষরন্তি সিন্ধব
ওঁ মধু। ওঁ মধু। ওঁ মধু।

তাইতো আমাদের দেশের ম্যারেজ রেজিস্ট্রী অফিসের করণিকগণ বসে বসে মাছি তাড়ান। অপর ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি অফিসে আরো ওয়ারকার নেবার জন্যে এ্যাডভারটাইজমেণ্ট দিতে হয়। জন এবং ক্যাথারীনে আজ যদি কোন ভোজ সভায় নিভৃতে দুই ঘণ্টা আলাপ হল, ব্যাস, রেজিষ্ট্রি অফিসের কাজ বেড়ে গেল। আবার

এদের চাইতে ও অধিক ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করেন বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার কর্মীগন।

কিছুদিন পরে হয়ত কোন্ এক সমুদ্রসৈকতে দেখা গেল, নির্জনে বসে জন এবং মেরী, রবার্ট এবং ক্যাথারীনকে। যে প্রেম ক্যাথারীন জনকে উপহার দিচ্ছিল সেই প্রেমের বাণীই উপহার দিচ্ছে রবার্ট কে। যদি ও এখন এ পার্থক্য ক্রমেই ঘুচে আসছে।

আমরা অনেকেই এখন আমাদের কালচারকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে ইউরোপীয় কালচার কে ধরতে হন্যে হয়ে ছুটেছি। ফল যা হবার হচ্ছে। বহু ঘরেই জমা হচ্ছে অশান্তি, কলহের স্তূপ। মনে যদি থাকে অশান্তির জঞ্জাল, কর্মে আসেনা উত্তম। আমি বলি ভাল। আমাদের বেকার সমস্যায় জর্জরিত দেশের পক্ষে ভাল। দেশে বহু উকিল মোক্তার ডিভোর্সের কেস পাচ্ছেন না। শহরগুলির ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি অফিসে আরো কর্মী নেয়া যাবে। অতএব ওটা ধরতেই হবে।

হে ইউরোপীয় কালচার। তুমি এস আমায় আপ্লুত কর। তোমার ভালটা না দাও অন্তত মন্দটা দাও। নতুবা আমাকে সকলে অশিক্ষিত বলবে। আনকালচারর্ড বলবে। আমি যে বিশ্ব প্রেমিক। তোমাদের মন্দটা না নিলে যে আমার বিশ্ব প্রেম থাকে না।

ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত গাওয়া হয়ে গেল। আমি বসেছি হরিদ্বারের গল্প শোনাতে। তপোভূমি হরিদ্বার, যেখানে গঙ্গা প্রথম অবতরণ করেছেন মর্ত্যভূমিতে। সেই তীর্থ শ্রেষ্ঠ হরিদ্বারের গল্প বলি।

রাণাবাবুর প্রশ্নে আবার বাস্তবে ফিরে এলাম।

—কি ভাবছেন? আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না?

বিনীত ভাবে উত্তর দিলাম

ভারতবাসী, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যারা রামায়ণ বা মহাভারত পড়েননি।

রাণাবাবু একটু হেসে বললেন,

—আমি জানতাম, আপনি এই উত্তরটাই দেবেন।

আমি, একটু অবাক হলেও, রাণাবাবু সেটা নজর না করে আবার বলতে শুরু করলেন—জানেন তো, মহাভারতের বিরাট রাজার দেশ ছিল আমাদের নেপালে। পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাত বাসের সময় এই বিরাট রাজার রাজসভাতেই আশ্রয় গ্রহণ করে, এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করে ছিলেন। এখন ভারতের যে রাষ্ট্রীয় এবং ভৌগোলিক সীমা দেখছেন, আগে কিন্তু তেমন ছিল না। ভারতবর্ষ ছিল অনেক বড়। নেপাল, ভূটান, সিকিম ছিল ভারতের মধ্যে।

আমার মনে একটু সন্দেহ হল। বিরাট রাজ্য যদি নেপালে হয়ে থাকবে তবে বিরাটের গোধন বাহিনী কোথা থেকে এল? তবে কি নেপালে প্রচুর পশুচারণ ভূমি রয়েছে? সেখানে কি প্রচুর গাভী পালন হয়? শুনেছি তো নেপালে পার্বত্যভূমি বেশী। হতে পারে। হিমালয়ের কোলে যদি পশুপালন হয় তবে নেপালে হবে না কেন? মনে ভাবি অন্তকথা। বনবাসের সময় পঞ্চ পাণ্ডবগণ দীর্ঘ দিন কাম্যবনে বাস করেছিলেন। পাণ্ডবগণ কি তবে মথুরা বৃন্দাবনের কাম্যবন ছেড়ে ভারতের উত্তর-পূব দিকে পার্বত্যরাজ্য নেপালে আশ্রম গ্রহন করেছিলেন? জানি না হবে হয়ত।

আর্য্যরা পশ্চিম থেকে এসে ভারতের দক্ষিনে এবং পূর্বে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে এগিয়ে যাচ্ছিল বটে। মনিপুরে অর্জুন বিবাহ করেছিলেন। এর উল্লেখ আমরা মহাভারতে পাই। তবে বিরাট নগর যে নেপালে ছিল তা আমার জানা নেই। তাহলে কি আগে নেপালের অপর কোন নাম ছিল? জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, সেখানে তর্কের মধ্যে যেতে চাই না। তর্ক করে দুটি মিলনের বিশ্বাসকে ভাঙতে চাই না। রানাবাবু ভাবুক 'তুমি আমি এক।' আমিও ভাবি 'রাণাবাবু, আমি এক।'

এ ভাবনা বড় সুন্দর। এ ভাবনায় শান্তি গড়ে উঠে। তাই হোক। এমনি করেই দুনিয়ার মানুষ ভাবুক। হানাহানি, সন্দেহ ভরা দুনিয়া এক হোক। দুনিয়ার মানুষ এক হোক। সেই তো কল্যাণ। সেই তো শান্তি। সেই তো সুন্দর। দুনিয়ার আকাশ, বাতাস ক্লেদমুক্ত হয়ে, সন্দেহমুক্ত হয়ে, নির্মল বারিতে ধৌত করে দিক মহা মানব জাতিকে।

গল্প করতে করতে রাত প্রায় ১২টা গড়িয়ে গেছে। চতুর্দশীর চাঁদ ঘুরে এসে মাথার উপর দাঁড়িয়েছে। মানুষের কোলাহল এখন অনেকটা স্তিমিত। আমাদের বিছানা কালি কমলির ধরমশালার ছাদেই পাতা হয়েছে। ঠিক রাণাবাবুদের বিছানা থেকে হাত দেড়েক দূরে। উপর থেকেই নীচের বারান্দাগুলি নজরে পড়ে। সারি সারি শুধু মানুষের পর মানুষ। পা ফেলে এগিয়ে যাবার যো নেই। এ যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্তিমদশা। অথবা মেঘনাদ যুদ্ধে জিতে গৃহে ফেরার পরে রামের সৈন্যদের অবস্থা।

হবেই বা না কেন? এদের মধ্যে কেহ হয়ত এসেছেন কেদারনাথ, বদ্রীনাথ দর্শন করে। আট দশ দিনের পথের ক্লান্তি, কেহ হয়ত আরো এগিয়ে গেছেন যমুনোত্রী অথবা গঙ্গোত্রী অথবা আরো দূরে গোমুখ। কেহবা মুসৌরী, দেরাদুন ফেরৎ। কেহ বা হৃষিকেশ, লছমন ঝুলা। আর এদের মধ্যে কেহ যদি কোথায় না গিয়ে থাকে— যেমন আমি। তা হলে অন্ততঃ কনখল, সপ্তর্ষি, ভীমগোডা, নিদেন পক্ষে হরিদ্বারের গঙ্গায় ডুব।

হরিদ্বারে এলে, কিছু না করলেও ঘুম পায়। প্রচণ্ড ঘুম পায়। শরীরটা মনে হয় প্রচণ্ড হাল্কা হয়ে গেছে। এখানে এলে পেছনের চিন্তা থাকে না। থাকে না সংসারের চিন্তা, আফিসের চিন্তা, রেশন ধরার চিন্তা। দশটা-পাঁচটায় শেওড়াফুলি লোক্যাল ধরে ডেলি প্যাসেনজারীর চিন্তা। সংসারের হলাহল, জনাকীর্ণ কোলকাতার কোলাহল পড়ে থাকে পেছনে। অনেক দূরে। একটা হাল্কা মন, একটা মুক্ত মন, ঘুরে বেড়ায় হরিদ্বারে।

একটু ভুল হয়ে গেল। জনাকীর্ণ কোলকাতার কোলাহল একদম ত্যাগ করা যায় না। ওটা আজকাল হরিদ্বার অবধিও ধাওয়া করেছে। আজকাল নানা ধরণের মানুষ ভীড় জমাতে শুরু করেছে হরিদ্বারে। জানি না আর কয়েক বৎসর পরে হরিদ্বারের অবস্থা কি দাঁড়াবে। এখনই হরিদ্বারের কোন কোন রাস্তা কলকাতার বড় বাজারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানুষ আসে হরিদ্বারে। কেহ আসে পুণ্যের লোভে। কেহ আসে ছুটি কাটাতে। কেহ আসে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়। কেহ আসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের আশায়। আবার আজকাল ব্যবসার খাতিরে ও কেহ কেহ আসে। কেহ নিতে চায় বিশ্রাম। তবে সপরিবারে কেহ যদি বিশ্রাম নিতে আসে, আমার মনে সন্দেহ জাগে বিশ্রাম তারা পান কিনা। তবে হ্যাঁ মানুষ আসে। হাজারে হাজারে মানুষ আসে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে এই হরিদ্বারে। সারা ভারতবর্ষ থেকে মানুষ আসে। আবার তারা চলে যায়। আসে পাঞ্জাবী, আসে গুজরাটি, কেরালিয়ান, নেপালী, বাঙালী, সিন্ধী, রাজস্থানী। কেহ বাদ যায় না। এমন কি বহু বিদেশীও আসে। কয়েকজন ইউরোপীয়ানের সাথে আমার আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়েছে। ওরা আসে, অবাক হয়ে দেখে। ঘুরে ঘুরে দেখে। যা দেখে তাকে ধরে রাখতে ফটো তোলে অজস্র ক্লিক ক্লিক শব্দ করে।

সিজেন এলে হরিদ্বারের ধ্যান ভঙ্গ হয় কি না জানিনা। তবে হরিদ্বারের হর এবং হরি, উভয়ে পালাই পালাই করতে থাকেন। হরি হয়ত মানিয়ে নেন। উপায় কি? কাছাকাছি তো যাবার যায়গা নেই। কিন্তু হর উঠে যাবেন আরো উপরে। অর্থাৎ স্বগৃহে। কৈলাশে।

ভবিষ্যৎ ভেবেই বোধ হয় মা মনসা দেবী এবং মাতা চণ্ডী দুটি পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে আছেন। হায় মাগো! তোমরা কলির জীবদের এখনও চিনতে পারলে না? হেঁটে যেতে কষ্ট হয়? অসুবিধা হয়? রোপওয়ে করে নেব। মা মনসাকে তো ইতিমধ্যেই রোপওয়ের নাগালে পাওয়া গেছে। মাতা চণ্ডী! তোমারও আর বেশী দেরী নেই। প্রস্তুত হচ্ছে রথ। হয়ত আর কয়েক বৎসর বাদে এলেই তোমাকে

ধরতে পরিশ্রম করতে হবে না। ট্রলিতে চেপে, দিব্যি আরামে, তোমার দর্শন করে ফিরে আসবো। পুণ্য লাভ হবে। কিছু ত্যাগ করব না। হে! হে! বাগো! আমাদের চিনতে পারনি তো এখনও? আমরা কলির জীব। আমরা চাঁদে যাই। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে চলেছি। আর তোমার ঐ পাহাড়টুকুর মাথায় যেতে পারবো না? দেখনা বদ্রীনারায়ণ বাবার অবস্থা। বাস এনে ফেলেছি তার দোরগোড়ায়। আর যাবে কোথায়? অবশ্য মাঝে মধ্যে দু-একটা বাস ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেও, আমরা ভয় পাই না। আমরা ধরবই তোমাদের। কিছু মাত্র পরিশ্রম না করে। আমরা কলির জীব।

হরিদ্বারের সাধু সন্তদের দেখলে কষ্ট হয় মনে মনে। আহা! বেচারারা! যোগ ধ্যান করার জন্যে গঙ্গার পারে, পাহাড়ের কোলে, আশ্রয় বেছে নিয়ে ছিলেন এই হরিদ্বারে। এবার হয়ত বাস্তহারা হতে হবে তাদের। কমণ্ডুল আর চিমটেটা নিয়ে পালাতে হবে উপরে। যাদের কাছে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'। তাদের কানের কাছে যদি বৈষয়িক মানুষ গুলি 'টাকা খাঁটি, টাকা খাঁটি' বলে ঐক্যতান জুড়ে দেয়? বেচারাদের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? কতক্ষণ 'তৃতীয় রিপুটিকে দমন রাখা যায়? সকলে নয়। কিছু কিছু 'টাকা মাটি'র দলে ঘাড় দোলায়। কেহ বা রাতের অন্ধকারে। কেহ বা প্রকাশ্যে। বাকীরা কেহ পালিয়েছেন উপরে। কেহ বা অনন্যোপায় হয়ে, কানে তুলো গুজে দিয়ে বসে আছেন হরিদ্বারে।

রাত অনেক হয়েছে। একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। গল্পের মধ্যে ডুবে থাকায় টের পাইনি। চাঁদ মাথার উপর থেকে সরে গেছে। সমস্ত কোলাহল নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দূরে মনসা পাহাড় কালো বোরখায় নিজেকে আবৃত করে বসে ঝিমুচ্ছে। পাহাড়ে উঠবার রাস্তাগুলির উপর দূরে দূরে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। জোনাকির মেলা বসে গেছে পাহাড়ের গায়ে। পাশের পাহাড়টা থেকে ময়ূরের 'কে-কা' রব থেকে থেকে ভেসে আসছে কানে। বিল্বকেশ্বর যাবার রাস্তাটা ছাত থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

॥ দুই ॥

বিল্বকেশ্বর। বিল্বকেশ্বর মন্দির। ভারী মনোরম জায়গা। পরিবেশটি ও তেমনি। অপূর্ব এর অবস্থান। ললতারো পুল পেরিয়ে যান। বাঁ দিক দিয়ে পশ্চিম দিকে কিছুটা এগিয়ে রাস্তাটা ভাগ হয়ে একটা পশ্চিমে, অপরটা উত্তর পশ্চিমে চলে গেল। সামান্য একটু চড়াই উৎরাই করে শেষের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই গাছের ছায়ায় ঘেরা মন্দির। বিল্বকেশ্বরে গেলেই মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার কথা। অদ্ভুত একটা শান্ত সমাহিত পরিবেশ। দুদিকে দুটি পাহাড় আড়াল করে রেখেছে জায়গাটিকে। আর একটা দিক ঢালু হয়ে নেমে গেছে। অসংখ্য বেলগাছে ছেয়ে আছে জায়গাটিকে। এছাড়াও বিভিন্ন বড় ছোট গাছের নিবিড় ছায়ায় স্থানটির প্রতি আকর্ষণ বাড়ায়। বিল্বকেশ্বর মন্দির থেকে পশ্চিম উত্তরে আর একটু ঢাল বেয়ে পিচ ঢালা রাস্তায় এগোলেই —শিবালিক পাহাড়ের গায়ে গৌরী কুণ্ড। গৌরী কুণ্ডের কাছেই ভোলা গিরির তপস্যা স্থল। পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি গুহা। কথিত আছে, তার মধ্যে তপস্যা করে ভোলা গিরি পবন পুত্র হনুমানজীর দর্শন লাভ করেন।

এস্থলে পাঠকদের কাছে সামান্য একটু নিবেদন পেশ না করে পারছি না। আমি লেখক নই, সাহিত্যিকও নই। দেশ দেখতে ভালবাসি। ঘুরতে ভাল লাগে। এটা আমার নেশা। বিশেষ করে ইতিহাসের নাম গন্ধ কোথায় জড়িত থাকলে তো কথাই নেই। আমি দেখি। আমি শুনি। কান পেতে শুনি তার ইতিহাস। অন্তরের অন্তরলোকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি। সেই যুগে, সেই কালে, সেই সময়ের উপর ভর করে তার রূপ, তার গন্ধ, তার রস আস্বাদন করতে চেষ্টা করি— চোখ বুজে। তাই যা দেখেছি—তাই লিখেছি। যা শুনেছি, তাই বলবার চেষ্টা করেছি। সত্যি কি মিথ্যে, তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না। সত্যি বলেই ধরে নেই। বিশ্বাসের দ্বারা মনের গহনে যে সুন্দর স্বপ্নপুরী গড়ে তুলেছি, বাস্তবের আঘাতে, তর্কের লাঞ্ছনায়, পাণ্ডিত্যের পবরদারীতে তাকে ভেঙ্গে দিতে চাই না। ওটা থাক সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। সত্যি যদি হয়, আপনার চাইতে আমিই খুশী হব বেশী। আর অসত্য হলে আপনারা তার বিচার করবেন, বিশ্লেষণ করবেন। তর্কের উপরে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবেন। আমি শুধু যা দেখলাম, তাই লিখলাম। যা শুনলাম, তাই বললাম। তবে মাঝে মাঝে আমার যেটুকু উপলব্ধি, সেটুকু বলার লোভ দমন

করতে পারলাম না। সেটা যদি সময়ে সময়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় পাঠক তা হলে নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।

আবার আমি ফিরে আসি বিল্বকেশ্বর মন্দির ছাড়িয়ে গৌরীকুণ্ডতে। তার সামান্য একটু দূরে ভোলাগিরির তপস্যাস্থল। ছোট গুহা। পাহাড়ের নীচে গুহা। একজন লোকই সেখানে বসতে পারে। গৌরীকুণ্ড থেকে গুহায় যাবার একটিমাত্র রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে একটু বাঁক নিয়ে। রাস্তার অপর দিকে খাদ। খাদের পরে আবার পাহাড়। গুহার সামনে একটুখানিক চত্বর। বসার জায়গাটি বেশ মনোরম। নির্জন তো বটেই। গুহার মধ্যে ভোলাগিরির মূর্তি রয়েছে ধ্যানরত অবস্থায়। গুহামুখে লোহার গেট। বলতে জনৈক সাধু (পাণ্ডাও হতে পারেন) গেট খুলে দিয়ে দেখালেন। হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে হয়। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঠুকে যাবে। সাধুজী কথায় কথায় জানালেন ভোলাগিরির পূর্ব নিবাস ছিল পাঞ্জাবে। এখানে এসে দীর্ঘদিন সাধনা করে হনুমানজীর দর্শন পান। তিনি স্নান করতেন ঐ গৌরীকুণ্ডের শীতল জলে। ঐ জলই একমাত্র তাঁর পানীয় ছিল। ভোলাগিরি সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প তিনি বললেন।

গল্পটা এখানে উল্লেখ করলাম।

ভোলাগিরি যখন এই গুহায় সাধনারত, তখন জনৈক বাঙালী রেঞ্জার সাহেব শিবালিক পাহাড়ে শিকারের জন্য এসেছিলেন। তখন নাকি প্রচুর বাঘ, বরাহ, ইত্যাদি বন্যজন্তু এইসব পাহাড়ে বিচরণ করত। আজকাল আর তাদের দেখা যায় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জন্তুর ভয়ে তারা সরে গেছে দূরে। যা হোক ঐ বাঙালী সাহেব একদিন একটা বাঘকে গুলি করলেন। গুলিটা বাঘের পায়ে লাগে। বাঘটা পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় ঐ গুহায়। তপস্যারত ভোলাগিরির পায়ের কাছে। ভোলাগিরি চোখ মেলে তাকালেন। তাঁর চোখে ফুটে উঠল ব্যথা। বাঘের এই কষ্ট দেখে ধ্যান ছেড়ে পাহাড়ে উঠে গেলেন। সেখান থেকে জরি বুটি সংগ্রহ করে এনে বাঘের পায়ে বেঁধে দিলেন। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাঘটা তখন ভোলাগিরির পায়ের কাছে বসে পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়তে থাকে।

এদিকে বাঙালী বাবু বাঘটাকে খুঁজে খুঁজে এই গুহায় এলেন। ঐ দৃশ্য দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এ কোন সাধারণ সাধক নয়। ভদ্রলোকের চোখ থেকে নেমে এল আনন্দের অশ্রু। তিনি আছড়ে পড়লেন তাপসের পায়ের উপর। ভোলাগিরি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তিনি ভদ্রলোকের মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ভদ্রলোক ভোলাগিরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। পরে তিনি গুরুকে নিয়ে এসেছিলেন বাঙলায়।

যখন সাধুজী আমাদের এই গল্প শোনাচ্ছিলেন হিন্দীতে তখন একজন অল্পবয়স্ক ছোকরা আস্তে আস্তে টিপ্পুনি কেটে উঠল—ওটা হয়ত পোষা বাঘ ছিল।

ছেলেটি হয়ত বুঝতে পারেনি যে, সাধুজী বাংলা বুঝতে পারবেন। সাধুজী কিছুটা বিরক্ত হলেন, আমিও হলাম। তিনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন,

—বাবুজী তোমার বয়স অল্প আছে। তাই তুমি সহজেই অবিশ্বাস করলে। তোমার ঐ মন নিয়ে হরিদ্বারে আসা উচিত হয়নি। তুমি বোম্বে কি দিল্লী গেলে ভাল করতে। সারকাস পার্টিতে তো বাঘ আছে। তারা তো সব পোষা। তবে তাদের আটকে রাখা হয় কেন? জখমি বাঘ যে কি ভয়ানক তা তুমি বুঝতে পারবে না।

লজ্জা পেলেও ছেলেটি আবার তর্ক করতে যেত। কারণ সেখানে কয়েক জন অল্প বয়সের ছেলে এবং মেয়ে ছিল। তাদের মাঝে কথাটা বলে হয়ত বোঝাতে চেয়েছিল 'দেখ, আমি কেমন বাস্তববাদী।' কিন্তু কথাটা যে সাধুজী ধরে নেবেন এটা ভাবেনি ও। এতগুলি লোকের মাঝে হেরে যাবে? বিশেষ করে যেখানে মেয়েরা মুচকি মুচকি হাসছে। প্রেসটিজ বলে তো একটা কথা আছে? আমি অবস্থাটা বুঝে ঈশারায় ছেলেটিকে থামতে বললাম। অনেকেই আমায় সমর্থন করল। অবস্থা বুঝে ছেলেটি সেখানে আর দাঁড়াল না। মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। আমি মনে মনে একটু হাসলাম। কিন্তু তখন লোকসান যা হবার তা হয়েগেছে। সাধুজী হয়ত আরো কিছু বলতেন। তা আর শোনা গেল না। চারি দিকে তাকালাম। ছেলেটিকে কোথায়ও দেখতে পেলাম না।

গৌরী কুণ্ডতে সুন্দর অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁধান বেঞ্চ রয়েছে। উপরে ছাদ। তিন দিক খোলা। একদিকে দেয়াল। কুণ্ড মানে—বাঁধান পাতকুয়া। বালতিতে করে জল তুলে পাশের চৌবাচ্চায় ভরতে হয়। পাশেই মেয়েদের স্নানের জন্য ছোট বাথরুমের মত করে দেয়া আছে। দেখলাম সেখানে কয়েক জন পাঞ্জাবী মেয়ে বৌ স্নান করছেন। আমি ও গামছা পরে স্নান করতে নেমে গেলাম। ভারী অপূর্ব শীতল জল। খেতেও খুব ভাল লাগে। পেট পুরে জল খেলাম। আরাম করে স্নান করলাম। মনটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কুণ্ডের পাশেই একটু উঁচুতে গৌরীমাতার মূর্তি। আরো অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে। ছোট কালো পাথরে খোদাই করা গৌরীমাতার মূর্তি। সকলেই স্নান করে মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করছে। পুজো দিচ্ছে।

হরিদ্বারে, লছমন ঝুলা, হৃষিকেশে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। পুজোর জন্যে এখানে পুরোহীত বা মন্ত্রের আয়োজন কম। কিছু মুড়ি, কিছু বন্য ফুল, সামান্য দু একটা বেল আম। যাত্রীরা নিজেরাই বিনা মন্ত্রে দুহাত দিয়ে দেবতাকে দিচ্ছেন। ভাল লাগল। ভক্তি এখানে প্রধান। মনের আকুতি এখানে মন্ত্র। অনুষ্ঠান এখানে গৌণ।

স্নান, পূজো শেষ হলে আমি সাধুজীকে অনুরোধ জানালাম—

—সাধুজী এ স্থানের মহাত্ম কিছু বর্ণনা করুন।

সাধুজী হাতের ঈশারায় আমাদের বসতে বলে, বলতে শুরু করলেন—এই যে দেখছ কুণ্ড, এরই নাম গৌরী কুণ্ড। মহারাজ দক্ষের বাড়ী ছিল কনখলে। আগে গঙ্গার মূল প্রবাহ ওখান থেকেই বয়ে যেত। বর্তমানে বাঁধ দেবার ফলে ও ধারের গঙ্গা শুকিয়ে গেছে। মহারাজ দক্ষের সাত কন্যা ছিল। ছোট কন্যার নাম ছিল সতী। সতীর বিয়ে হয়েছিল মহাদেবের সঙ্গে। অপরাপর কন্যাদের বিয়ে করেছিলেন বিভিন্ন দেবতা গন। মহারাজ দক্ষ মহাদেবকে সহ্য করতে পারতেন না মোটেই। একবার মহারাজ দক্ষ মস্তবড এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। সকল দেবতা, মুনি-ঋষিদের নিমন্ত্রণ করলেন তিনি। বাদ পরলেন শুধু মহাদেব।

আমাদের শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন—সে গল্প আমরা জানি। সতী জোর করে মহাদেবের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞ সভায় এলেন। দক্ষ মুখে পতির নিন্দা শুনে তিনি যজ্ঞের আগুনে দেহত্যাগ করলেন।

সাধুজী তার দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—ঠিকই বলেছেন। মহাদেব সতীর দেহ নিয়ে পাগলের মত ঘুরতে লাগলেন। দেবতারা দেখলেন বিপদ। তারা নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন। নারায়ণ সতীর দেহ চক্র দিয়ে একান্ন টুকরা করে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিলেন। গড়ে উঠল একান্ন পীঠ। মাতা সতী আবার জন্ম নিলেন হিমালয়ে। নাম হল তার গৌরী। কিন্তু তিনি তো মহাদেবের স্ত্রী। তাই তাকে পাবার জন্যে শুরু করলেন মাতা গৌরী দীর্ঘ সাধনা। এক এক স্থলে এক এক রকম ভাবে হাজার হাজার বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করে চললেন মাতা সতী। অবশেষে দেবতাদের নির্দেশে এই গৌরী কুণ্ডে এসে তপস্যা শুরু করলেন। তখন মাতা গৌরী কেবলমাত্র এই কুণ্ডের জল পান করতেন। এই জলেই তিনি স্নান করতেন। ঐ যে বিল্বকেশ্বর মন্দির দেখছেন। ঐ স্থলেই তিনি মহাদেবের দর্শন পান। মাতা যখন তপস্যা করতেন তখন তাঁর দেহে হাজার হাজার পাতা ঝড়ে পরত। মাতা গৌরী তপস্যায় জীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি মনে মনে ভাবলাম—তাইতো মায়ের আর এক নাম অপর্ণা।

সাধুজী আবার বলতে শুরু করলেন,

—এ কুণ্ডের জল যত খুশী খান। হাজারো বালতি দিয়ে স্নান করুন। কোন দিন ফুরাবে না। কমবে না এর জল। খেয়ে দেখুন। কি অপূর্ব এর স্বাদ। এই জলে একমাস কোন শীর্ণ শিশুকে স্নান করালে রোগ সেরে যাবে। যে কোন চর্মরোগী নিয়মিত স্নান করলে চর্মরোগ থাকবে না।

বাইরে রোদের তাপ কিছুটা বেড়ে উঠেছে। গরম বেশ পড়েছে। কিন্তু জায়গাটা নানা বৃক্ষের ছায়ায় আচ্ছাদিত বলে গরম অনুভব হয় না। ঝিরঝিরে উত্তরে হাওয়ায় বেশ আরাম দায়ক বলে মনে হচ্ছিল। সাধনা করার উপযুক্ত পরিবেশই বটে। একটু দূরে বিল্বকেশ্বরে কোন পূণ্যার্থী হয়ত পূজো দিচ্ছেন। একটানা ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। ভেসে আসছে মহাদেবের প্রণাম-মন্ত্র।

"ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুসে।
নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমঃ ত্রিশূল হস্তায় দণ্ডপাশংসিপা নয়ে।
নমঃ ত্রৈলোক্য নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
ওঁ বানেশ্বরায় পরকার্ণবতারনায়, জ্ঞান প্রদায় করুণাময় সাগরায়।
কর্ন্দরকুণ্ডল ধবলেন্দুজটাধরায়, দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিপরমেশ্বরঃ॥"

পাহাড়ের গাছে গাছে বিভিন্ন পাখিদের কলগুঞ্জনে মনটা উদাস হয়ে যায়। ওরাও যেন সৃষ্টিকর্তাকে ওদের প্রণাম নিবেদন করছে। জায়গাটা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। প্রচণ্ড ঘুমে চোখ দুটো বুজে আসছে। দেহে এসেছে অবসাদ। দেহকে ছেড়ে দিয়েছি। এ যেন মন চলে গেছে এক দিকে। তারই বিরহে দেহ আর উঠতে চাইছে না। কি অদ্ভুৎ অবস্থা! আমি ভক্ত নই—পুণ্যার্জন করতেও আসিনি। এসেছি দেখতে, এসেছি জানতে, এসেছি ক্ষুধার্ত মনকে খেতে দিতে। তাই মনকে ছেড়ে দিয়েছি। মন তুমি চড়ে খাও। আমি অলসভাবে পরে থাকি হেথায়। মনে সুর জেগে উঠেছে—"মন চল নিজ নিকেতনে।" কিন্তু কোথায় আমার নিকেতন? কোথায় আমায় যেতে হবে? কোথায় আমি যাব? কোথা থেকে এসেছি? মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠে। না, ভাবতে ভাল লাগছে না। চলুক পৃথিবী। যেমন খুশি চলুক। আমি শুধু অলস দেহটাকে নিয়ে পড়ে থাকি এখানে।

এই মুহূর্তে বিজ্ঞান পড়ে থাক দূরে। বাস্তব অভিমান করে চলে যাক। যুক্তি, তুমি ঘুরে এস কিছু সময়ের জন্য। তর্ক, তুমি এস না এখানে! সবাইকে ছুটি দিয়ে জড় দেহটা পড়ে থাকুক শুধু হেথায়। এ যে পূর্ণ মিলনভূমি। সতী কঠোর সাধনা করেছেন পতি লাভের আশায়। ভক্ত সাধনা করেছেন ভগবানকে লাভ করার জন্যে। কেহই ব্যর্থ হয়নি, কেহ বিফল হয়নি, কেহ শূন্য হাতে ফিরে যায়নি। আমিও ব্যর্থ হইনি, আমিও বিফল হইনি। আমিও পেয়েছি। আমারও বুভুক্ষু মন পেয়েছে অনেক, অনেককিছু।

কতক্ষণ এমনভাবে পড়েছিলাম জানি না। অল্প বয়স্ক একজন সাধু ডেকে তুললেন আমায়। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন—আর কত ঘুমোবে? রাত অনেক হয়েছে।

পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে জ্বালিয়ে দেখলাম রাত ৯টা বাজে। ধরফরিয়ে উঠে বসলাম। ক্ষিদে পেয়েছে বলে মনে হল না, তবে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। শরীর খুব ক্লান্ত, পা দুটো উঠতে চাইছে না। তবুও উঠলাম। গাছের তলায় শক্ত পাথরের উপর এত সময় ধরে ঘুমিয়েছি, ভাবতেই অবাক হয়ে গেলাম। উঠে কুণ্ডের জল আজল ভরে অনেকটা খেলাম। চোখে মুখে জল দিতে কিছুটা ভাল লাগল। সাধু বাবা এতক্ষণ অবাক হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলেন, এবার বললেন—এখানে কোথায় উঠেছ?

আমি উত্তর দিলাম—কালি কমলিতে।

—এখন যাবে কোথায়?

—আজ্ঞে, হর-কী-পেইড়ীতে গিয়ে স্নান করব।

একটু মুচকি হাসলেন তিনি। সাধুবাবা আমার হাতে একটা আম আর একটা কলা দিয়ে বললেন—এটা খাও।

খেতেই মনে হল খুব ক্ষিধে পেয়েছে। আর দাঁড়ালাম না। হন্ হন্ করে হেঁটে চলে এলাম। পিছন ফিরে চাঁদের আলোতে তাকিয়ে দেখলাম—সাধুজী দাঁড়িয়ে আছেন আর হাসছেন। আমি আর ফিরলাম না।

॥ তিন ॥

মায়া। হরিদ্বারের আর এক নাম মায়া। মায়াপুরী হরিদ্বার। সাধন-তীর্থ হরিদ্বার। আমার কল্পলোকের হরিদ্বার। গঙ্গার ধারে নির্জনে বসে ভাবছিলাম হরিদ্বারের ইতিহাস—মায়াপুরী হরিদ্বারের কথা। মায়াপুরীই বটে। যিনি হরিদ্বারে না গেছেন, তিনি বুঝতে পারবেন না এ মায়ার খেলা। আর যিনি অন্ততঃ একবারও গেছেন হরিদ্বারে, তিনি উপলব্ধি করবেন মহামায়ার খেলা। সুসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল লিখেছেন—"একবার যে হরিদ্বারে গেছে, দ্বিতীয় বার যাবার জন্য তার আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখেছি।" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। যখন তাঁর বই পড়েছি, তখন এতটা অনুধাবন করতে পারিনি। আজ উপলব্ধি করছি হাড়ে হাড়ে।

আজ হরিদ্বারের এই নির্জন গঙ্গার পারে বসে বহুদিন আগের ছোট একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকায় করে বেলুড় যাচ্ছিলাম। নৌকোতে দুই ভদ্রলোকের মধ্যে হরিদ্বার, কেদার, বদ্রী নিয়ে গল্প হচ্ছিল। ওদের কথা শুনে মনে হল ওরা কিছুদিন আগে কেদার, বদ্রী হরিদ্বার দর্শন করে ফিরেছেন। ওরা এই সামান্য পথটুকুর মধ্যে রাস্তার এবং ওখানকার যে বর্ণনা দিলেন তাতেই আমার মন পুলকিত হয়ে উঠলো। বাড়ীতে ফিরেই শুরু হলো আমার কেদার, বদ্রী এবং হরিদ্বারের ছবি দেখা এবং বই পড়া। মনের মধ্যে হরিদ্বার যাবার পরিকল্পনা গড়ে তুললাম। আগেই বলেছি পথ আমায় হাতছানি দিলেই আমি বেরিয়ে পড়েছি পথে। কোন অবস্থাকেই আমাকে এ সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আমার এই উদ্ভট্ কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকেই আমায় উপহাস করে, করে বিদ্রূপ। আবার অনেকে আর একটু এগিয়ে 'পাগল' আখ্যাও দিয়ে ফেলেছে। আমি প্রতিবাদ করিনা। আমি হাসি। আর মনে মনে বলি।

'শ্যামের বাঁশি শুনে আমি রইতে নারি ঘরে।'

হরিদ্বারের মায়া দেবীর মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একজন সন্ন্যাসী সেদিন একদল পূণ্য লোভাতুরা নরনারীকে মায়া দেবীর মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন একান্ন পীঠের এক পীঠ এই মন্দির। আমি তখন অন্য কথা চিন্তা করছিলাম। হরিদ্বারের উত্তরে হিমালয়। হরিদ্বার থেকে তার শুরু। হিমালয় মানেই দেবতাদের লীলাভূমি। পরম রম্যস্থান। ক্রমেই দুর্গম এই পথেই চলে গেছেন পঞ্চ পাণ্ডব স্বর্গারোহণে। স্বর্গ ওখানে আছে কিনা জানি না। তবে সুন্দরকে যদি স্বর্গ বলে।

দুর্গম যদি তার পথ হয়। মন যদি সেখানে গেলে, পার্থীব সব কিছু ভুলে গিয়ে অপার্থীব আনন্দ লাভ করে—তাহলে স্বর্গ আছে, স্বর্গ আজও আছে। ওকেই বলব দেবলোক।

অপর দিকে হরিদ্বারের দক্ষিণ নরলোক বা মর্তলোক। অর্থাৎ আধুনিক শহর গঞ্জ, গ্রাম, অর্থ, অনর্থ, হানাহানি, ঈর্ষা, দুঃখ, রোগ, শোক, সবকিছু মিলিয়ে নরলোক। মহাভারত ভূমি। মহাজাতির বাসভূমি। ওখানে রয়েছে মায়া। মহামায়ার খেলা চলছে পুণ্য ভারতভূমি জুড়ে। মায়াপুরী হরিদ্বারে এস। হীম শীতল পুণ্য বারি, গঙ্গার জলে অবগাহন কর। ঝেড়ে ফেল মায়া। এই মহামায়ার মন্দিরে রেখে যাও ওকে। হরিদ্বারের দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর মায়াহীন সুন্দর লোকে। ধ্যান গম্ভীর হয়ে চিন্তা কর। বুঝতে চেষ্টা কর। ব্যস।

হরিদ্বারে দাঁড়ালে মনে হয় এ যেন দুটি ভিন্ন বিপরীত গামী উপলব্ধির সীমানা স্থল। এক দিকে নরলোক। অপর দিকে তপোলোক ছাড়িয়ে দেবলোক। এক দিকে মায়া। অপর দিকে মায়ামুক্তি। এক দিকে আর্থিক চিন্তা। অপর দিকে পরমার্থিক চিন্তা। একদিকে বন্ধন। অপর দিকে মুক্তি। একদিকে যুক্তি। অপর দিকে বিশ্বাস। মাঝখানে দাড়িয়ে মায়াপুরী। গঙ্গা। কপিলেশ্বরের গঙ্গা। ব্রহ্মপুরার গঙ্গা। খল খল করে হাসছে, আর উভয়কেই হাতছানি দিয়ে ডাকছে। "ওরে আয়। ফিরে আয়।" সন্তানকে যেমন করে ডাকে মায়। ডাক শুনে কেহ ফিরে আসে। কেহ চলে যায়।

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে ভীড় জমায় হরিদ্বারে। প্রায় সকলেই ফিরে যায়। আবার কেহ কেহ অসন-বসন ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায় তপোভূমি হরিদ্বারে অথবা আরো দূরে। আরো উপরে। কি পায় তারা? কি পায় জানি না। তবে তাদের মধ্যে ফেরে খুব কম। হয়ত পায় তার পরম পাওয়া তাই থেকে যায়।

অমৃতস্য পুত্রাঃ কি অমৃতের খোজ পায়?

গঙ্গার তীরে হা করে বসে তাকিয়ে থাকি দূরে। তাকিয়ে থাকি চির রহস্যময় শিবালিক পাহাড় ছাড়িয়ে আরো দূরে। যতদূর সম্ভব দৃষ্টি যায়। যেখানে মেঘলোক গিয়ে মিশেছে ঐ পাহাড়ের সারির পেছনে। ওখানে কোন দিন যেতে পারব কিনা জানি না, তবে বাসনা আছে। মন চলে গেছে অনেক আগেই সেখানে। এ যেন প্রথম দেখাতেই প্রেম। গিরিরাজ হিমালয়ের সাথে প্রেম। দেবতাত্মা হিমালয়ের সাথে একটি মানব শিশুর প্রেম। হে মহাত্মা হিমালয়। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি—বৈষ্ণবরা যেমন গিরি-গোবর্ধনের প্রেমে পড়েন। কোন বৈয়াকরণীক হয়ত উপহাস করবেন। আমি বলব আমি সুন্দরের প্রেমে পড়েছি।

রাত কিছুটা হয়েছে। হর-কী-পেইড়ীর ঘাট অনেকটা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। ঘাটের আশে পাশে কিছু সাধু-সন্ন্যাসী বসে আছেন স্থির হয়ে। তুলা-পেজা মেঘের দল এক দিক থেকে অপর দিকে চলে যাচ্ছে। মেঘের সাথে চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলছে হরিদ্বারের আকাশ জুড়ে। তারই আলোছায়ার ছটা পড়ছে উজ্জ্বল গঙ্গার বুকে। বড় ভাল লাগছে। বড় মধুর লাগছে। গঙ্গার ধারে বসলে ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুম পায়। ওপারের ঘাটগুলি জনশূন্য হয়ে গেছে। দূরে চণ্ডীপাহাড়ের মাথায় চণ্ডীমন্দিরের বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। ওরই কাছ থেকে চলে গেছে দেরাদুন মুশৌরী যাবার বাস রাস্তা।

গৃহীরা অনেকক্ষণ আগে ঘরে ফিরে গেছে। এবার গঙ্গার পারে রাজ্যপাট বসাবেন সাধু-সন্ন্যাসীর দল। চারি দিকে চেয়ে দেখি দোকানপাট অধিকাংশ ঝাপ বন্ধ করেছে। একটু দূরে একটা কাপড়ের দোকান এখনও খোলা রয়েছে। দোকানদার কানে ফোন তুলে কার সাথে যেন কথা বলছে। হাতে টাকা গুণছে। আজ লাভ বোধ হয় ভালই হয়েছে। লাভের কড়ি গুণছে আর হাসছে। হাসির সাথে সাথে ওর সুগভীর ভুরিটা তুলছে তালে তালে।

কি সুন্দর সিন। দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সিন। একটির নায়ক গৃহী। অপরটির নায়ক সন্ন্যাসী। থিয়েটারে যেমন গায়ের সিনে নায়ক অভিনয় করে। পেছনে গ্রামের পটভূমি। ছোট একটা নদী। দূরে গ্রামের বাড়ী। ধানক্ষেতর আল। এ না হলে অভিনয় জমবে কেন? আবার কলিকাতার ঘিঞ্জি গলিতে নায়ক অভিনয় করছে। পেছনে সিন হবে—দু'পাশে বস্তিবাড়ীর সারি। মাঝখান দিয়ে সরু গলি। কলতলায় জল নিয়ে বচসা। ফুচকাওয়ালার হাঁক। আর একটু বাস্তব দেখাতে—হয়ত কোন ছোট ছেলে প্রকৃতির আহ্বানে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে পায়ে পায়ে মাখামাখি করে বসে আছে ড্রেনের পাশে। হয়ত বা মাথাটা নীচু করে একটা কাঠি দিয়ে মাটির উপর দাগ কাটছে। আর বিড় বিড় করে আপন মনে কথা কইছে খেলার ছলে। একটু দূরে তিনতলা বাড়ীর জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভন্ ভন্ করে পাখা ঘুরছে। ইত্যাদি। মোট কথা পেছনের পরিবেশ অনুযায়ী সিন চাই দৃশ্য চাই নতুবা অভিনয় জমবে কেন?

ঐ ভুরিওয়ালা দোকানদারের হাতে ফোন। অতবড় ভুঁড়ি। গলায় সরু সোনার চেইন। বিজলি বাতি। বিজলি পাখা। কাঁচের আলমারীতে সাজান দোকান। এসব না হলে কি মানাত?

আবার ঐ যে সন্ন্যাসী বসে আছেন, ওঁর হাতে চিমটে, কমণ্ডুল, মুখে বড় বড় দাড়ি, গোঁফ। জটার ভারে মাথাটা নুয়ে পড়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দেহে ছাই মাখা, পরনে সামান্য একটু ট্যানা, পাশে কালো কম্বলটা গোল করে গুটান।

ওর যদি পেছনে পাহাড় অথবা গুহা অথবা শ্মশান। নিদেনপক্ষে এই গঙ্গার ঘাট। নির্জন হলে আরো ভাল হয়। এসব না হলে কি মানাত!

এবারে ঐ সন্ন্যাসী মহারাজকে কলকাতায় নিউমার্কেটে ছেড়ে দাও। আর ঐ দোকানদারকে নির্জন পাহাড়ের গুহায় আটক করে রাখ। অন্ততঃ দুই তিন দিন। ব্যাস, আর চিনতে হবে না। ওদের তিন দিনেই খেল খতম।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চটাই এমন। এখানে সকলেই আমরা অভিনেতা, অভিনেত্রী। পেছনে উপযুক্ত সিন দেয়া আছে। তুমি শুধু অভিনয় করে যাও। কখন হাস, কখন কাঁদ, কখন বা বসে গালে হাত দিয়ে ভাব। অভিনয় শেষ হলে খাটিয়ায় অথবা গাড়ীতে চেপে বাড়ী চলো। তখন সুর বাজবে পেছনে মন চল নিজ নিকেতনে। পড়ে রইবে পেছনে সাধের চিমটা আর গলার সরু চেইন। আর তোমার ঐ আগুনে বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিয়ে গল্প জমাবে পাড়ার মেধ, কেলু হরির দল। ওরা কিন্তু তখন ও ভাববে না—ওদের আগুনে বিড়ি ধরাতে আসছে আগামী দিনের বিশু, পঞ্চা, পটলার দল। ভারী সুন্দর, ভারী অদ্ভুত! ভারী আশ্চর্য!

যে মুহূর্তে হরিদ্বারের গঙ্গার পাশে বসে আবোলতাবোল চিন্তা করছি, হয়ত সেই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অথবা রাশিয়ার পলিটব্যুরোর চেয়ারম্যানের নির্দেশে বিজ্ঞানীরা অ্যাটম অথবা হাইড্রোজেনের চাইতে শক্তিশালী বোমা বানাতে রত, যাতে করে পাড়ার পঞ্চা, বিশু, মেধ, কেলুর দলকে আর বিড়ির সুখ টান দিতে হবে না। এক সাথে সকলেই বাড়ী ফিরে যাওয়া যাবে। সময় পাব না সুরটা শুনবার 'মন চল নিজ নিকেতনে'। এটাও সুন্দর। এটাও মন্দ নয়। ইনি ভাবছেন আমি কোন দিনই বাড়ী যাব না। উনি ভাবছেন 'আমিও যাব না'। সকলেই অমরা ভাবছি। না ভাবলেই আমরা মুস্কিলে পড়ে যাব। সকলে যে যা ভাবে ভাবুক। আমি বলি মাতা গঙ্গা, তুমি কি ভাবছ? গিরিরাজ হিমালয়, তুমি কি ভাবছ? তোমাদের দু'জনের ভাবনা শুনে আজকের মত উঠে যাই ধরমশালায়, ফিরে যাই কালিকমলিতে।

ফিরতে চাইলেই কি ফেরা যায়? আমি যা চাই, তাই পাব, তাই হবে? এমন শক্তি, শক্তিধর প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যানের আছে কি না জানি না। অন্ততঃ আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নেই।

প্রচণ্ড ঘুমের চোখ নিয়ে ঢুলতে ঢুলতে ফিরছি। ফিরছি কালিকমলিতে। ফেরার পরিবর্তে হোঁচট খেতে হল ভোলাগিরির আশ্রমের সামনে। কোন দিকে না তাকিয়ে আপন মনে হাঁটছি। হঠাৎ পিছন থেকে এক মহিলার কণ্ঠস্বর।

—দাদা না? দাঁড়ান দাদা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আলো আঁধারে ভাল করে চোখে ঠাওর হচ্ছিল না।

একটি মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। মুখের উপরে একটু ঝুঁকে পড়ে দেখে নিয়ে বলল,

—আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই। দাদাই ত। ওগো শুনছ, আমি যে দাদার গল্প তোমায় বলেছিলাম, এই সেই দাদা। দাদা আপনি কেমন আছেন?

বলতে বলতেই নীচু হয়ে গড় হয়ে আমার পায়ে নমস্কার করল। আমি তো অবাক। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে আমি কিছুটা হকচকিয়ে গেছি। তাই আশীর্বাদ করার জন্যে হাতটা একটু উপরে উঠল। জড়িত গলায় বললাম,

—আমি তো তোমায় ঠিক চিনতে পারলাম না।

আমার কথাটা আর শেষ করতে দিল না মেয়েটি। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। বলল,

—চিনতে পারছেন না? তাই না? চিনবেন কি করে? কত দিন পরে তো দেখা। তা ছাড়া পথের পরিচয়ে হতভাগ্য বোনকে কি কেউ মনে রাখে? না রাখা যায়? আপনি যেমন ভুলো মন। ইস্, আপনার যে আবার দেখা পাব, এ আমি কোনদিন ভাবতেই পারিনি। যখন যে মন্দিরে পূজো দিতে গেছি তখনি আপনার মঙ্গল কামনা করে বলেছি, হে ঠাকুর, দাদার দেখা যেন আবার পাই।

বিস্ময় আমার আরো বেড়ে যায়। মেয়েটি অনর্গল কথা বলেই চলেছে। অথচ নামটা বলছে না। পরিচয়টা দিচ্ছে না। আর আমি তখন আকাশপাতাল ভেবে চলেছি। আর খুঁজছি। রাগ হল মনে মনে। আবার আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করলাম—তোমাকে কিন্তু এখনও আমি—

এবারেও মেয়েটি আমার কথা শেষ করতে দিল না। আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। ও আমার বিড়ম্বনাকে উপভোগ করছে।

—ওগো শুনছ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? দাদাকে নমস্কার কর।

একটি অল্পবয়সের ছেলে পায় হাত দিয়ে নমস্কার করল। এতক্ষণ আমি ওকে দেখতে পাইনি। মেয়েটি তখনও বলে চলেছে,

—এই দাদাকে না পেলে কোথায় ভেসে যেতাম। কোন নরকে ডুবে যেতাম। তোমাকেই বা পেতাম কি করে?

বলতে বলতে মেয়েটির গলার স্বর ভারী হয়ে এল। আলো আঁধারে যেটুকু দেখা যায়, মনে হয়েছিল মেয়েটির চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করছে। চট্ পট্ আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে আবার হেসে উঠল।

—দাদা, আপনি কেমন আছেন? কোথায় উঠেছেন? রাত অনেক হয়েছে। এখানে আর দাঁড়াবেন না, চলুন আমাদের ঘরে।

বলতে বলতেই খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলল। ভারী মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি। অপরিচিত একটি মেয়ের সাথে কোথায় গিয়ে উঠবো। আর এই ছেলেটিই বা কে? ও কেন কথা কইছে না? এ আবার বিধাতার কোন খেলা ঘটতে চলেছে? ঘুমটুম তখন কোথায় চলে গেছে। মাথার দুটো শিরা দপ্ দপ্ করছে।

হঠাৎ অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের একটা ঝলক খেলে গেল ছেলেটির কথায়।

—অঞ্জলি তোমাকে কিন্তু দাদা এখনও চিনতে পারেননি।

অঞ্জলি কিন্তু আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে তখনও হেসে চলেছে। 'অঞ্জলি' নামটা কানে যেতেই পেছনে ফেলে আসা অভিনয়ের একটা দিন ফুটে উঠল। এ যেন সিনেমার ফ্লাস ব্যাক্ করে দেখান। ঝুঁকে পড়লাম মেয়েটির মুখের উপরে। হ্যাঁ! এইবার পেয়েছি। এইবার চিনতে পেরেছি। দশ বারো বৎসর আগের একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল।

প্রচণ্ড লজ্জা পেলাম। আমার বিব্রত ভাব দেখে অঞ্জলি সাথে সাথে বলে উঠল,

—আপনার তো মনে রাখবার কথা নয় দাদা। অমন হাজার হাজার বোনের সাথে আপনার তো দেখা হয় রাস্তায়। কজনার কথা মনে রাখবেন। চলুন আর দাঁড়াবেন না। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। আমাদের ঘরে গিয়ে সব কথা হবে।

আমি গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে বললাম,

—তোমার ঘর হয়েছে?

—এই হরিদ্বারই আমার ঘর ফিরিয়ে দিয়েছে। ঐ তো ঘরের মালিক দাঁড়িয়ে।

অঞ্জলি ইশারায় ছেলেটাকে দেখিয়ে দিল। ছেলেটিও লজ্জা পেয়ে মাথা নোয়াল।

—চলুন দাদা! চলুন। ঘরে গিয়ে সব শুনবেন।

অঞ্জলি হাত ধরে আবার একটা ঝাকুনি দিল। বাধ্য হয়ে চলতে শুরু করলাম। যাচ্ছিলাম ফিরে কালিকমলির ধরম শালায়। হলনা তা। যেতে হল অঞ্জলিদের সাথে। তাই বলছিলাম, ফিরতে চাইলেই কি ফেরা যায়? যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়?

॥ চার ॥

মানুষের জীবনটাই কতকগুলি ঘটনার সংযোজন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একের পর এক ঘটতে থাকে এই ঘটনাগুলি। আমরা মনে করি কোনটা আকস্মিক, কোনটা অপ্রত্যাশিত, কোনটা মামুলি, কোনটা বা অদ্ভুত। কিন্তু ঘটনা ঘটে যায়। থেমে থাকে না। এ যেন একটা শিকল। একটার পর একটা আংটা আসবেই। অথচ আমরা জানি না সামনে কোনটা আসছে। তাই ঘটনার আকস্মিকতা আমাদের করে বিহ্বল, হতচকিত।

অঞ্জলিও তেমনি জানত না ওর জীবনে কত বড় একটা ঝড় আসছে ধেয়ে। আর পাঁচটা মেয়ের মত অঞ্জলিও বিশ্বনাথকে নিয়ে দেখেছিল অনেক মধুর স্বপ্ন। আনন্দে, হাসিতে আর গানে ভরিয়ে তুলবে ছোট্ট ঘরখানি। কতদিন বেনারসের গঙ্গার ঘাটে বসে অঞ্জলি বলেছে বিশ্বনাথকে তার সোনালী স্বপ্ন। বিশ্বনাথ কথা বলে কম। শুনেছে বিশ্বনাথ অঞ্জলির কথা। আর মুচকি মুচকি হেসেছে। অনেক সময় অঞ্জলি বিশ্বনাথের নীরবতা ভঙ্গ করতে না পেরে রেগে যেত। বিশ্বনাথ কিন্তু রাগত না। বেনারস থেকে হরিদ্বার। বেনারসের কাশি মিত্তিরের ঘাট থেকে হরিদ্বারের হর-কী-পেইড়ীর ঘাট অনেক দূর। অনেক দূর। আজ থেকে দশ বারো বৎসর আগের কথা। এর মধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গেছে গড়িয়ে।

ফিরে আসি হরিদ্বারে। গঙ্গার ধার ধরে হর-কী-পেইড়ীর দিকে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে একটা গলি। গলি ধরে একটুখানিক এগোলেই অঞ্জলিদের ঘর। ঘর নয় বাসা। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই একটি গাড়োয়ালী কিশোরী দরজা খুলে দিল। কোলে তার তিন চার বৎসরের ফুটফুটে ফর্সা একটি ছেলে।

অঞ্জলি হিন্দীতে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, ছেলে কখন ঘুম থেকে উঠেছে? উঠে কেঁদেছে কি না? দুধ খাওয়ান হয়েছে কিনা? অঞ্জলি হাত পাততেই ছেলেটি অঞ্জলির কোলে ঝাপিয়ে এল। অঞ্জলি ছেলেটিকে বুকের মধ্যে নিবীড়ভাবে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। আমি অবাক বিস্ময়ে অঞ্জলিকে দেখতে লাগলাম। অঞ্জলি আমার দিকে ফিরে গদগদ স্বরে বললে,

—দাদা এটি আমার ছেলে, বিন্টু।

আমি হেসে উত্তর দিলাম,

—তুমি না বললেও বুঝতে পেরেছিলাম।

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ একটা চেয়ার এনে আমায় বললে

—বসুন দাদা !

চেয়ারটা টেনে বসে পড়লাম। অঞ্জলি ছেলেকে চুমু খেতে খেতে বললে

—জানেন দাদা, মার মুখে শুনেছি আমার উপরে আট দশ বৎসরের এক বড় ভাই ছিল। আমার যখন দুই তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মারা যান।

অঞ্জলি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আবার বলতে লাগল,

—সেই শোক বাবা আর সামলাতে পারেন নি। এক বৎসর যেতে না যেতেই হার্টফেল করেন, মাত্র তিন দিনের অসুখে। এক বৎসরের মধ্যে দু-দুটা শোক পেয়ে মা পাগলের মত হয়ে গেলেন। মা আমাকে বুকে জড়িয়ে রোজ 'বাবা বিশ্বনাথের' মন্দিরে গিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতেন।

অঞ্জলির চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

আমি একটু নীরব থেকে বললাম

—কেঁদ না অঞ্জলি। তুমি না থাকলে তোমার মা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেতেন।

—আমি থেকেই বা কি হল দাদা। মাকে কি আমি সুখী করতে পারলাম ? আমার জন্যেই তো মা—

আর বলতে পারল না ও, ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম,

—কেন, তোমার মা ? তিনি কোথায় ?

—জানি না।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলাম। অঞ্জলি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল,

—আপনি যেদিন আমায় দিল্লীতে বাবার বন্ধুর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তার পরের দিনই আমি আপনার দেয়া টাকা দিয়ে টিকেট কেটে বেনারস চলে গেলাম। বেনারসে গিয়ে শুনলাম মা লজ্জায়, দুঃখে, শোকে কোথায় চলে গেছেন। কেউ বলতে পারল না। একবার ভাবলাম ওর সাথে দেখা করব। কিন্তু যখনি মনে হল এই মুখ নিয়ে আর 'ওর' কাছে যাওয়া চলে না। ফিরে গেলাম আবার দিল্লীতে। বাবার বন্ধু সেই কাকার কাছে। আমাদের তিন কুলে তো আর কেউ নেই। দিল্লীতে প্রায় দুই বৎসর ছিলাম। কাকার দুটি ছেলে। দুজনেই বিয়ে করেছে। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতাম আর ঘরের কাজে সাহায্য করতাম। সময় সুযোগ পেলেই চাকরির জন্য চেষ্টা করতাম গোপনে। অবশেষে ওরা বেড়াতে এল হরিদ্বারে। আমিও ওদের

সাথে এলাম। এখানে এসে বাচ্চাদের নিয়ে রোজই গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে আসতাম। একদিন বিকেলে হঠাৎ 'ওকে' দেখতে পেলাম।

বুঝলাম 'ওকে' মানে ওর বরকে। বিশ্বনাথকে আমি কোন দিন দেখি নি। মনে মনে আগেই একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম এই সেই বিশ্বনাথ। কারণ আমি যে ছেলেটির সাথে অঞ্জলিকে আজমীঢ়, অম্বর এবং আগ্রায় দেখেছিলাম এ ছেলে সেই ছেলে নয়। তাকে আমি দুই তিন বার দেখেছি। কাছে থেকে দেখেছি। কথাও বলেছি। আর তাছাড়া সে তো বাঙালী নয়। আমি যতদূর শুনেছি তার বাড়ী আজমীঢ়ে।

অঞ্জলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। অঞ্জলির ছেলে অবাক হয়ে ওর মাকে দেখছে। বিশ্বনাথ কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে দরজার এককোণে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

গাড়োয়ালী মেয়েটি এতক্ষণ পাশের ঘরে চা করছিল। তিন কাপ চা এনে বিশ্বনাথ এবং আমাকে দিয়ে বললে—খান বাবুজী।

অপর কাপ অঞ্জলিকে দিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে,

—রোও মাৎ বহিন। রোও মাৎ।

আমি যে কি করব, কি বলব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। গরম চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললাম,

—কেঁদ না অঞ্জলি। কেঁদে তো আর মাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

অঞ্জলি আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল,

—না। তা হয়ত আসবে না। কিন্তু এ দুঃখ আমি কোথায় রাখব দাদা। মা তো আমার বিলটু সোনাকেও দেখে যেতে পারল না।

আমি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বললাম,

—বিশ্বনাথের বাড়ী বুঝি বেনারসে?

বুদ্ধিমতী অঞ্জলি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে—হ্যাঁ। ওর সাথেই মা আমাকে বিয়ে দিতে চেয়ে ছিলেন। ওদের বাড়ীতেই আমি মানুষ হয়েছি। আমাদের পাশের বাড়ী ওদের। ওর সাথে ছেলে বেলা থেকে খেলা ধুলা করেছি। ওকে কত মেরেছি। আমার নখের দাগ এখনও ওর পিঠে আছে। আমার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মাঝে মধ্যে আমাকেও দু এক ঘা বসিয়ে দিত।

বলেই অঞ্জলি বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এমনিতেই বিশ্বনাথ একটু লাজুক।

—এই কি হচ্ছে? বলে মাথাটা আরো নীচু করল। আমি হো হো করে হেসে

ফেললাম। এতক্ষনে ঘরের বিষাদের আবহাওয়া খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল। অঞ্জলি সোহাগভরে বিল্টুকে দু' একটা চুমু খেয়ে বললে,

—দ্যাখ্। দ্যাখ্। কে এসেছে। মামা এসেছে।

আমি বুঝলাম অঞ্জলি নিজের লজ্জাটাকে এড়াবার জন্যে বিল্টুকে ও কথাগুলি বলছে, নচেৎ ও কথাগুলির কোন মানেই হয় না। বিল্টু এখনও মামা নামক শব্দটি আয়ত্বে আনতে পারেনি। অঞ্জলি বিল্টুকে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বললে—দাদা, রাত্রে আপনি কি খাবেন? ভাত না লুচি?

মামা শব্দের মহিমাতেই হোক অথবা মায়ের বাসনা পুরণার্থেই হোক, বিল্টু আমার কোলে আসতে একটুও অমত করল না। ছোট দুটি হাত দিয়ে সবলে আমার হাত ঘড়িটাকে খুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। আমি ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম,

—এত রাতে ও সব হাঙ্গামা করতে যেও না। আমি এক্ষুনি উঠবো।

অঞ্জলি তার বড বড চোখ দুটো আমার উপর ন্যাস্ত করে বললে—আপনি কি একা এসেছেন? না আর কেউ এসেছেন?

আমি ওর জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে হেসে বললাম,

—কেন, একা এলে বুঝি বাড়ী ফিরতে নাই?

—না, তা থাকবে না কেন। যদি সেখানে তার নিজের জন না থাকে।

মনে মনে বললাম নিজের জন কে? নিজের জন খুঁজতেই তো পথে পথে ঘুরছি। মুখে বললাম,

—আমি একাই এসেছি।

এতক্ষণে বিশ্বনাথ মুখ খুলল,

—তা হলে তো কথাই নেই দাদা। যে কটা দিন হরিদ্বারে থাকবেন আমাদের কাছেই থাকবেন।

বিপদ বুঝে শেষ অস্ত্র হানলাম,

—থাকব তো, শুতে দেবে কোথায়?

বিশ্বনাথ জবাব দিল,

—কেন দাদা? আমাদের তিনখানা ঘর। একটা আমাদের। অপরটায় কুন্তি শোয়। আর একটা খালি পড়ে থাকে। খাটিয়া আছে বিছানা আছে। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। অঞ্জলি তার সাথে আবার যোগ করল,

—শোব কেন? সারা রাত ধরে শুধু গল্পই করব। এখনো তো আপনার কথা কিছুই শোনা হয়নি। আপনি শুধু বলুন রাত্রে কি খাবেন?

বুঝলাম বিপদ মাথার উপর ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। অসহায় ভাবে বললাম,

—যেতে যখন দেবেই না, তখন তোমরা যা ভাল মনে কর, তাই কর। পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

আমার বলার ভঙ্গিমা দেখে অঞ্জলি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

—আমরা মোগল নই দাদা। মুখার্জী। খাটি ভরদ্বাজ গোত্র। আর খানার কথা বলছেন ? খানা আপনায় খেতে হবে না। গরম গরম চারটি ভাতই খাবেন।

প্রস্তাব শুনে মনে মনে খুশী না হয়ে পারলাম না। ভাবলাম একদিন না হয় রান্না ভাত খাওয়ালে। রোজ রোজ হোটেলে অনিয়মিত ভাবে খেতে খেতে হোটেলের নাম শুনলেই ক্ষিদে মিটে যায়। তবুও বরাত ভাল হরিদ্বারের দিদির হোটেলে গেলে কিছুটা বাংলা রান্না খেয়ে তৃপ্ত হই। মুখে বললাম,

—তোমাদের যা খুশী তাই কর।

অঞ্জলি খুব খুশী হয়ে বললে,

—এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। আপনারা দুজনে মুখ হাত ধুয়ে এসে গল্প করুন আমি ততক্ষণে রান্নার ব্যবস্থাটা করে ফেলি।

অঞ্জলি পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরেই কুন্তি একটা কাচা কাপড় নিয়ে এসে বললে,

—লিজিয়ে বাবুজী। মুখ হাত ধুয়ে লিন। ইধার আসুন।

কুন্তির হিন্দি বাংলা মিশান কথা শুনতে বেশ ভালই লাগছিল। প্রশ্ন করলাম,

—বাংলা শিখলে কি করে ?

—কেনে বহিনের কাছে শিখে নিলম। কুছু কুছু পারি। ছব বলতে পারি না। লেকিন বুঝতে পারি।

কুন্তিকে সংগ্রহ করেছে বিশ্বনাথ। ওর অফিসের দারোয়ানের মেয়ে। বিশ্বনাথ চাকুরী করে দেরাদুনে।

বিশ্বনাথ আর আমি গল্প করছি। বিশ্বনাথ বলছে আমি শুনছি। বিশ্বনাথ বাপের একমাত্র সন্তান। ওরা চিরকাল কাশীবাসী। এমন কি বিশ্বনাথ হবার পরে ওর বাবা কলকাতা পর্যন্ত যায়নি। তবে বাবার মুখে শুনেছে কলকাতার কাছেই কোন একটা গ্রামে ওদের আদি বাড়ী ছিল। বিশ্বনাথের দূরসম্পর্কীয় এক কাকা সেখানে আছেন। বিশ্বনাথের আর কোন নিকটতম আত্মীয়-স্বজন আছে বলে বিশ্বনাথ জানে না। অঞ্জলির সাথে বিশ্বনাথের বিয়ের ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবার পরে, কিছু দিনের মধ্যে মা এবং বাবা মারা যান। বিশ্বনাথের মা ছিলেন বাতের রুগী। একেবারেই পঙ্গু। বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। ওর মা অঞ্জলিকে ভাল বাসতেন খুব। অঞ্জলিও মাকে ভাল

বাসতো এবং শুশ্রূষা করত। মায়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল অঞ্জলিকে ঘরের বৌ করে নিয়ে আসা। সে আশা ভেঙে যেতেই মার মনে খুব ব্যথা লাগে।

মা মারা যাবার পরেই বাবা কেমন যেন হয়ে গেলেন। কথাবার্তা খুব একটা বলতেন না, দিনরাত ঠাকুরঘরে পড়ে থাকতেন। তারপর একদিন পুজো করতে করতেই বাবা চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিশ্বনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

খুব ভোরে অঞ্জলির হাক ডাকে উঠে বসলাম।

—দাদা চট্ করে রেডি হয়ে নিন।

আমি অবাক হয়ে বললাম কেন?

—মনসা পাহাড়ে যাব। উঠুন। উঠুন।

অতএব উঠতে হল।

হেঁটেই উঠছি মনসা পাহাড়ে। বিশ্বনাথ অবশ্য প্রস্তাব করেছিল রোপওয়েতে চড়ে যাবার। অঞ্জলি প্রবল আপত্তি তুলে অগ্রাহ্য করে দিল সে প্রস্তাব।

মনসা পাহাড। হরিদ্বারের একটি প্রধান দর্শনীয় এবং আকর্ষণীয় স্থল। পাহাড়ের চূড়ায় মনসা দেবী এবং অন্যান্য দেব দেবীগণের মন্দির রয়েছে। যতদূর মনে হল পাহাড়ে উঠবার দুদিক থেকেই রাস্তা রয়েছে। তা ছাড়া রোপওয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। রাস্তা দুটিও বেশ বাঁধান। অনেক যাত্রী আবার সর্টকার্টেও ওঠে।

আমার কাঁধে বিল্টু। ওর শরীরটা ভাল নেই। একটু জ্বর জ্বর হয়েছে। বাড়ীতে রেখে গেলে কুন্তি ওকে রাখতে পারবে না, কাঁদবে। সুতরাং মামা-ভাগ্নে মিলে মনসা পাহাড় আরোহণ। মামার কাঁধে ভাগ্নে। অঞ্জলি এবং বিশ্বনাথ অবশ্য বিল্টুকে নিতে চেয়েছিল। কেন জানি না বিল্টু মামার আকর্ষণই বেশী অনুভব করেছে। এই না হলে মামা-ভাগ্নে!

মনসা পাহাড়ের একটা দিক গিয়ে ঠেকেছে ভীম গোডায়। অপর দিকটা বিল্বকেশ্বর মন্দিরের গায়ে। মনসা পাহাড়ের পা ছুঁয়েই উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে হরিদ্বারের প্রধান সড়ক। হরিদ্বার স্টেশন থেকে যতই উত্তর দিকে এগোনো যাবে, ততই মনসা পাহাড় আর গঙ্গার দূরত্ব ঘুচে আসবে। অবশেষে হর-কী-পেইড়ী থেকে একটুখানি ভীম গোডার দিকে গেলেই, ব্যবধান থাকে মাত্র কয়েক গজ। হরিদ্বার অনেকটা 'ব' আকৃতির মত। এর সরু দিকটা উত্তরে। চওড়া দিকটা কনখলে। মনসা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এই রকমই আমার মনে হয়েছে।

পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি এবং পুজো দেবার জন্য অফিস রয়েছে। অফিসে কর্মচারী ইত্যাদিও রয়েছে। মনসা পাহাড়ে পানীয় জলের ভালো বন্দোবস্ত

রয়েছে। রোপওয়ে থাকার ফলে তীর্থযাত্রীদের ভীড়ও খুব বেশী। কিছু কিছু যাত্রীদের লক্ষ্য করলাম, মন্দির দর্শনের চাইতেও রোপওয়ের আকর্ষণ বেশী। এ যেন মনসা দেবী ভাবছেন 'এরা আমায় দর্শন করতে আসছে।' রোপওয়ে বলছে 'তা নয়, আমার আকর্ষণে আসছে।' যাত্রীরা আসছে। বিশ্রাম নিচ্ছে, পূজো দিচ্ছে, দেবীকে প্রণাম করছে। নিবেদন করছে অন্তরের বাসনা। নিবেদন করে কি পেল ভাবে না। নিবেদন করেই তৃপ্ত। ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখছে। দু একটা খাবারের দোকানও রয়েছে। কেহ কেহ খাচ্ছেন। নেবে যাবেন নীচে। চড়াইয়ে যে ক্লান্তি, অবসাদ ছিল, মাতৃপদে নিবেদন করে খুশীর জোয়ারে নেমে যাচ্ছে। যারা পূজো দিতে আসে, তারা আসে সকালে। আর যারা দৃশ্য উপভোগ করতে আসে, তারা আসে বিকালে। সন্ধ্যায় নীচের হরিদ্বারে জ্বলে উঠে বিজুলির আলো। মনসা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করার মত। শুনেছি এই মনসা পাহাড়ে চণ্ডীদেবীর সাথে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ হয়েছিল। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তা হলে এ পাহাড়ের নাম চণ্ডীপাহাড় না হয়ে মমসা পাহাড় হল কেন? জনৈক পণ্ডাকে প্রশ্ন করতেই, সরাসরি উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে হেসে বললেন,

—যেই-মনসা, সেই চণ্ডী, সেই কালী। নাম আলাদা। আসলে সবই এক, যেমন, জল আর পানী।

উত্তর শুনে আমি একটু হাসলাম মনে মনে। অভ্রান্ত যুক্তি। এক এক স্থানে এক এক রূপ? কেহই বিফল হবেন না। যিনি দেখতে চান কালী রূপ? চলে যান কলিকাতা। যিনি দেখতে চান রাধা? চলে যান বৃন্দাবনে। যিনি দেখতে চান কামাক্ষ্যা? চলে যান আসামে। যিনি দেখতে চান অন্নপূর্ণা? চলে যান বেণারসে। যিনি দেখতে চান মাতা চণ্ডীকে? চলে যান নীল পর্বতে। আব যিনি দেখতে চান মনসা দেবীকে, চলে আসুন হরিদ্বারের এই মনসা পাহাড়ে। 'কোন্ রূপে দেখতে চাও তুমি আমায়? সবরূপে আমি বিরাজমান মহাভারত ভূমে।'

আমি মনে মনে হাসি, আর বলি—মাগো, আমি যা চাই, তা তুমি দেবে কি? আমি ভীষণ আলসে কুঁড়ে মানুষ। আমি কিছু না করে পেতে চাই। আমি চাই সুখ। আমি চাই হাসি। আমি চাই অর্থ। আমি চাই আরাম। আমি চাই না দুঃখ। আমি চাই না কান্না। আমি চাই না অর্থ বা পরমার্থ। আমি চাই না ক্লেশ বা পরিশ্রম। তুমি দেবে কি মাগো আমায়?

পাণ্ডার কথা শুনে খুশী হতে পারলাম না। মনসা পাহাড় নাম কেন হল জানা হল না। দুনিয়ার সব কেন'র উত্তর কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই 'কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়ে কেহ হয়েছেন বিজ্ঞানী কেহ হয়েছেন সন্ন্যাসী। আর আমি বেরিয়েছি

পথে। সব 'কেন'র উত্তর মেলা ভার। যদিও কিছুদূর পর্যন্ত 'কেন' 'কেন'র উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু শেষ অবধি 'কেন'ই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে উত্তর না পেয়ে। অথচ এই 'কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়েই মানুষ হয়েছেন মহান। দেবতা হয়েছেন গরীয়ান।

রাত্রে হরিদ্বারের দুই তীরের দৃশ্য দুই রকম। পশ্চিম তীরে দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে তাকালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ পাহাড় সব মিলিয়ে যেন রহস্যময় স্থল। আবার পূর্ব তীরে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে, আলোর মেলায় সাজান হরিদ্বার অপূর্ব। পশ্চিম তীরে কোলাহল। পূর্ব তীর নীরব। পশ্চিম তীর চঞ্চল পূর্ব তীর ধ্যানমগ্ন।

আমি আর বিশ্বনাথ গঙ্গার পূর্ব পারে বসে গল্প করছিলাম। অঞ্জলি আসেনি। বিন্টুকে নিয়ে রয়েছে ঘরে। আমি বললাম বিশ্বনাথকে,

—তোমাদের সাথে অঞ্জলিদের পরিচয় হল কেমন করে ?

—সে অনেক কথা দাদা। অঞ্জলির বাবা মারা যাবার পরে অঞ্জলির মা আমাদের বাড়ীতে রান্না বান্না করতেন। কারণ মা ছিলেন পঙ্গু, বাবা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। বামুনের হাতে ছাড়া অন্যের হাতের রান্না তিনি খাবেন না। ফলে আস্তে আস্তে অঞ্জলির মা হয়ে উঠলেন আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। আমার বাবা মা অঞ্জলির মাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। এমন কি আমাদের আলমারির চাবিও তার কাছে থাকত। অবশ্য ওরা তার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছিল।

অঞ্জলি খুব একটা ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও সুন্দরী বলা চলে। বিশেষ করে ওর একপিঠ ঘন কালো চুল আর ডাগর ডাগর চোখ দুটি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। রংটা ফর্সা নয়, আবার কালোও নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যাকে বলে।

আমি বললাম,

—তোমাদের বিয়ের প্রস্তাবটা কে আগে দিয়েছিলেন ?

বিশ্বনাথ এবার লজ্জায় মাথাটা নীচু করল। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল,

—আমার মা।

ঘটনাটা মোটামুটি এই রকম।

বিশ্বনাথের মা বিশ্বনাথের বাবার কাছে কথাটা প্রথম পাড়েন—ওঁরা তো আমাদের পাল্টি ঘর। ব্যানার্জী বংশ ছোট নয়। ওঁরা লোকও ভাল।

—হ্যাঁ, সবই তো বুঝলাম। এবার তোমার আসল কথাটা বলতো ?

—তুমিই যখন ওদের অভিভাবক, অঞ্জলিকে ঘরের বউ করে নিয়ে এলে কেমন হয় ? আমার বিশুর সাথে ওকে মানাবেও ভাল। একমাত্র ওরা কিছু দিতে পারবে না।

বিশ্বনাথের বাবা এতক্ষণ শুনেই গেছেন। এবারে তিনি ফুঁসে উঠলেন,

—কি বললে তুমি? আমার কি পয়সার অভাব আছে? আর থাকলেই কি নিতাম? আশ্রিতকে আশ্রয় দিয়ে তার কাছ থেকে পণ নেব? আমার ধর্ম্ম আছে না?

ভয়ে ভয়ে বিশ্বনাথের মা বললেন,

—না গো না। আমি তা বলিনি।

পাশ ফিরে শুয়ে বিশ্বনাথের বাবার পিঠের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,

—তবে তুমি আর দেরী কর না। আমি ওদের দুটিকে এক যায়গায় দেখে শান্তিতে চোখ বুজি।

—বেশ। তোমায় আমি কষ্ট দেব না।

অঞ্জলির মা প্রস্তাবটা শুনে আনন্দে প্রথমে কথাই বলতে পারেনি। বিশ্বনাথের বাবাই বলেছিলেন তাকে।

—দেখুন বেয়ান, আপনাকে জিজ্ঞেস করা আমার কর্তব্য। তাই করছি, নতুবা আমার মেয়েকে আমি যা খুশী তাই করব।

অঞ্জলির মা কোন উত্তর দিতে পারেনি। আনন্দে তার দুচোখ বেয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়েছে। বিশ্বনাথের বাবা শুধু বিশ্বনাথের মার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হেসেছিলেন। আর বোধ হয় অলখ্যে হেসেছিলেন ভাগ্যবিধাতা।

বিচ্ছেদের কাহিনী শুনেছিলাম অঞ্জলির মুখে। আগ্রা থেকে দিল্লী যাবার পথে। সে এক করুন কাহিনী। একটি অসহায়া নারীর আর্তনাদ। বিশ্বনাথ তাকিয়ে আছে গঙ্গার দিকে। হয়ত ভাবছে? ভাবুক।

॥ পাঁচ ॥

খাটিয়ার উপরে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিলাম। চিন্তা করছিলাম অঞ্জলির কথা। ওর ভাগ্য বিড়ম্বনার এক সকরুণ কাহিনী। ঘুম চোখ থেকে সরে গেছে অনেক আগে। বহুদিন আগের কথা। আজ সব কথা মনেও পড়ছে না।

আজ থেকে দশ বার বৎসর আগের কথা। সে বারে আমাদের দলটা বেশ ভারী ছিল। দিল্লী থেকে টুরিষ্ট বাস নিয়ে পনের কুড়ি দিনের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম পথে। চিতোর উদয়পুর দেখে পুষ্কর তীর্থ ঘুরে আজমীঢ়ে এসেছি। দুপুর তখন গড়িয়ে যায় যায়। বাতাসে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ার পরশ। অবশ্য গায়ে তেমন গরম একটা কিছু দেবার প্রয়োজন বোধ হয় না। নীল আকাশ জুড়ে প্রখর রৌদ্র কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

আজমীঢ় সরিফের বর্ণনা বা রাজস্থানের বর্ণনা দেওয়া থেকে আপাততঃ বিরত থাকছি। আমি বুঝতে পারছি অঞ্জলির কথা না বললে রস ভঙ্গ হবে। তা হলেও অঞ্জলির কথা বলতে গেলেই আসবে কিছু কথা। যাকে বলে পেছনের দৃশ্য। আগেই বলেছি পেছনে দৃশ্য না থাকলে অভিনয় জমে না। সুতরাং ওটা আমায় বলতেই হবে। ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইতেই হবে।

আজমীঢ়ের মেইন গেট দিয়ে আমরা সদলে চলেছি ভিতরে। আমি সবার পেছনে পড়ে রয়েছি। সব খুটে খুটে দেখে দেখে চলেছি। আবার মনের মানুষ পেলেই কিছু নেবার আশায় আলোচনা জুড়ে দিচ্ছি। এর ফলে দলের কাছে থেকে জুটেছে একদিকে তাগাদা অপর দিকে বিদ্রুপ। এলাম ঝড়ের গতিতে, দেখলাম, চলে গেলাম। এটা আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না। তা হলে নিলাম কি ? অনেকে ক্যামেরা নিয়ে এসে ফটোর পরে ফটো তুলে নিয়ে যায়। আমিও ফটো তুলতে চেষ্টা করি বটে। তবে যান্ত্রিক ক্যামেরার নয়। মনের ক্যামেরায়। এসব কথা এখন থাক। এখন চলুক অঞ্জলির কথা, ওরা ওঘরে এতক্ষণে বিলটুকে আদর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি চিন্তা করছি অঞ্জলির কথা। দশ বার বৎসর আগের কথা।

আবার আজমীঢ় গেটে ফিরে আসি। এ দিকে দেখতে দেখতে চলেছি। চোখে পড়ল গেট থেকে একটু দূরে গাছের ছায়ায় একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। ছেলেটি শান্ত ভাবে কথা বলবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। নিশ্চয়ই তেমন কোন ব্যাপার নয়। এতো আজকাল হরদমই দেখা যায় ঘাটে পথে।

তাতে আমার দাঁড়িয়ে পড়বার মততো কিছু হয় নি। ঐ যে আগেই বলেছি। পথে বেরুলে কোন মানুষের উপর নজর পড়লে, আলাপ করতে ইচ্ছে হয়। লাভ হয়েছে। একদল দেখিয়েছে ঔদাসীন্য। অপর দল দিয়েছে অনেক, যার মূল্যায়ন করা যায় না।

কানটা খাড়া হয়ে উঠল। অন্যদিকে তাকাবার ভান করে শুনতে চেষ্টা করলাম ওদের কথা। দূর থেকে স্পষ্ট শোনা না গেলেও বুঝতে পারছিলাম, ছেলেটি খাঁটি হিন্দীতে কথা বলছে। মেয়েটি হিন্দী বললেও বাংলা টান আছে। অতএব গোলমাল। এবার ফিরে দাঁড়ালাম। এক পা দু পা করে এগিয়ে যেতেই আলাপ বন্ধ করে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবখানা হচ্ছে 'কি চাই' গোছের। বিশেষ করে ছেলেটির চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ।

আমি বললাম,

—ম্যায় আপকো পাশ এক বাত পুছুঙ্গা ?

ছেলেটি উত্তর দিল,

—বাতাইয়ে।

দূর থেকে দেখেছিলাম, তাই ভাল নজর করতে পারিনি। কাছে যেতেই দেখলাম, সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। দাড়ি পরিষ্কার করে কামান—গোপটাকে সযত্নে রাখা হয়েছে। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট, বুক চওড়া। হাতের দু' আঙ্গুলে দামী দুটো পাথর-বসান আংটী; নাকটা বেশ খাড়া। নাক অপেক্ষা চোখ দুটো বেমানান। চোখের মণি দুটোও নিবীড় কালো নয়, কিছুটা লাল ছোপ আছে। গায়ে একটা লাল আঁটো-সাটো দামী গেঞ্জি, পরণে প্যান্ট, হাতে রিস্টওয়াচ। বেশ স্মার্ট বলে মনে হল।

মেয়েটিকে ভাল করে নজর করতে পারলাম না। মাথাটা নীচু করে আছে। আঙুল দিয়ে কাপড়ের আঁচল জড়াচ্ছে। তবে সবার আগে নজরে পড়ে ওর এক পিঠ কাল চুল। চুলকে বাগে আনতেই মেয়েটি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বারবার। অন্ততঃ আমার এই এক মিনিট থেকে দু' মিনিট অবস্থানকালে এলো খোপা ভেঙে পড়েছে পিঠের উপর। ছড়িয়ে পড়েছে এক রাশ চুল। মনে হল চুলে তেল দেয়নি মেয়েটি অনেকদিন। মনে ভাবলাম ওটা একটা ষ্টাইল হতে পারে। মেয়েটি একবার মাত্র আমার দিকে তাকাল। ঐ ক্ষণিকের দেখাতেই নজর কাড়ে ওর কাজল-কালো চোখ দুটি। মনে হল মেয়েটি অনেকক্ষণ কেঁদেছে। তাই চোখ দুটো কিছুটা ফুলে উঠেছে।

আমি ছেলেটিকে প্রশ্ন করলাম,

—আপকা ঘর আজমীঢ় মে ?

—জী, হ্যাঁ।

—এহি আপকা জানানা হ্যায় ?

—আপকা কুছ জরুরত হ্যায় ?

এবারে ছেলেটির স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেল। আর এগোবো কিনা ভাবছি। আমতা আমতা করে বললাম,

—নেহি। হাম আপকো—

—মেহেরবানী করকে আপ যাইয়ে আপকা কাম মে।

ছেলেটি পরিষ্কারভাবে তার নির্দেশ জারি করে দিল। না, আর থাকা চলে না। এর পরে হয়ত আসবে অর্ধচন্দ্র। অবএব প্রস্থান। ঘুরে সবেমাত্র এক পা গিয়েছি,

—একটু দাঁড়ান। আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন ?

বিস্ময় আর কোথায় আছে ? চমকে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে বললাম,

—আপনি বাঙালী ?

—হ্যাঁ, আপনি বেড়াতে এসেছেন ? এখানে কতদিন হল এসেছেন ? আপনি কি একা এসেছেন ?

একই সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করল ও আমায়। আমি বিস্মিত হলাম। আমি বললাম,—আমরা দেশ ঘুরতে বেড়িয়েছি। আমরা কোথাও উঠিনি, আজই চলে যাব।

আমার উত্তর শুনে মেয়েটি একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ল। মুখে শুধু বলল, 'ও'।

মেয়েটি হয়ত আরো কিছু বলত, কিন্তু ছেলেটি ওকে আর সে সুযোগ দিল না। একটা হাত ধরে একরকম টেনে নিয়ে চলে গেল।

—অঞ্জলি, ইধার আও।

অনুমান করলাম, মেয়েটির নাম অঞ্জলি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখলাম একটা টাঙায় চাপিয়ে নিয়ে চলে গেল ছেলেটি। অঞ্জলি কিন্তু বার বার আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। আমার মনে সন্দেহ হল, কিছু একটা ঘটেছে, অথবা ঘটতে চলেছে। আমার আর কি-ই-বা করার আছে। একে তো বিদেশ-বিভূঁই। না চিনি রাস্তাঘাট, না চিনি লোকজন। তাও যদি দু-এক দিন থাকতাম, হয়ত খোঁজখবর করতাম। আর সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি তো কিছুই জানি না। সবটাই একটা অনুমান। হয়ত কিছুই হয়নি।

অঞ্জলির সাথে আমার দেখা হওয়ার প্রথম পর্বের যবনিকা এখানেই টানতে হল।

॥ ছয় ॥

আমরা সময় সময় যে ধারণা করি, তা ঠিক ঠিক ঘটে গেলে নিজেদের যে খুবই দূরদর্শী মনে করি। আবার হয়ত আর একটি ঘটনা আমার চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চলতে শুরু করল, তখন নিজেকে কত অসহায় মনে হয়। আমরা অনুমান করি কতগুলি যুক্তি-লক্ষণ, আচার-আচরণের উপর ভিত্তি করে। যখন মেলে তখন বুঝতে হবে আমার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ঠিক আছে। আর যখন মিলবে না, বুঝতে হবে যার উপর চিন্তা প্রতিষ্ঠিত করেছি, তার কোথাও গলদ আছে।

অঞ্জলি সম্পর্কে আমার ধ্যান ধারনা কোথাও কোথাও মিলে গেছে। আবার কোথাও কোথাও মেলেনি। মানুষের চরিত্র মেলান যে কত বড় দুরুহ কাজ সেটা যারা চিন্তা করেন তারাই বোঝেন। অঞ্জলি আর তার সাথের ছেলেটির জীবন যাত্রা যে সহজ খাতে বইছিল না সে অনুমান আমার যথাযথ হয়েছিল। আবার অঞ্জলির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চিন্তায় আমার ভুল থেকে গিয়ে ছিল। হরিদ্বারের গীতা ভবনে বসে অঞ্জলির দিকে যতবার তাকিয়েছি ততবার আমার তাই মনে হয়েছে। একথা এখন থাক। আমি এসেছি হরিদ্বার দেখতে। তপোভূমি হরিদ্বারের গল্প শোনাতে। স্বভাবতই হরিদ্বারের গল্প শোনাতে গিয়ে এসেছে অঞ্জলি প্রসংগ। যতটুকু না শোনালে নয় ততটুকুই শোনাব। এখন বলি হরিদ্বারের গীতা ভবনের কথা।

হরিদ্বারের গীতা ভবন মায়া দেবীর মন্দিরের কাছেই অবস্থিত। পরিবেশটি অত্যন্ত শান্ত এবং স্নিগ্ধ। এখানে এসে বসলে মনটা বেশ সমোহিত হয়ে উঠে। মন্দিরের মূল বিগ্রহ রাধা কৃষ্ণের মূর্তি। শ্বেত পাথরের ভারী সুন্দর মূর্তি। দেখলে মন ভক্তি-রসে আপ্লুত হয়। বিগ্রহের সামনে হলঘর। দেয়ালের গাত্রে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করা আছে। চতুর্দিকের দেয়ালে টাঙ্গান রয়েছে রামায়ণ মহাভারত এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্রাবলী। আমি ঘুরে ঘুরে বোঝাচ্ছিলাম চিত্রগুলির বিভিন্ন বিষয়বস্তু। অঞ্জলি এবং বিশ্বনাথ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছিল সব। এক সময় আমি ক্লান্ত হয়ে বললাম,

—এবারে তোমরা ঘুরে দেখ। আমি একটু গঙ্গার পারে গিয়ে বসি।

বিশ্বনাথ অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলল,

—দাদা তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এবার দাদাকে একটু বিশ্রাম দাও।

অঞ্জলি একটা কটাক্ষ হেনে বললে,—আমি একাই প্রশ্ন করেছি? তুমি করনি?

হেসে উভয়কে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

—তোমাদের প্রশ্নে আমি ক্লান্ত হইনি। তোমাদের দেখবার সুযোগ করে দেবার জন্য বলেছি। তোমরা দেখ, আমি গঙ্গার পারে গিয়ে বসি।

ওরা দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আমি আপন মনে গঙ্গার পারে বসে ভাবছিলাম অনেক কথা। পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত ঘটছে কত অভিনয়।

সীতা ভবন থেকে গঙ্গা অনেক দূর। ফেলে আসা অভিনয়ের দৃশ্যগুলি ভীড় জমায় মনে। এই মুহূর্তে মনের মুকুরে ভেসে উঠে অঞ্জলির ফেলে আসা কয়েকটি দিন। যে দিনগুলির কথা অঞ্জলি ভুলতে পারবে না কোনদিনই। অন্ততঃ যতদিন অঞ্জলি থাকবে এই পৃথিবীর পান্থশালায়।

ভূপ সিন আবার তুলি। পেছনে অম্বরের দুর্গ, প্রাসাদ। মহারাজ মানসিংহের খাস দুর্গ। আকবরের প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ। তাকে ছেড়ে ভাবা যায় না মুঘলদের ইতিহাস। মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের নায়ক মানসিংহ। এই মহারাজ মানসিংহের সাথে মোলাকাত হয়েছিল বাঙলার বার ভুঁইঞ্যাদের। সে বড় জব্বর মোলাকাত। বাঙলা ভোলেনি মানসিংহকে। মানসিংহও যতদিন বেঁচে ছিলেন বাঙলাকে ভুলতে পারেন নি। চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্যের অস্ত্রধার পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। পরীক্ষা করতে এসে বড় কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তাকে। আকবর বাদশাহের শ্যালক বড়ই বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস ওরা একযোগে পরীক্ষাটা দেয়নি। দিলে যে কি হোতো বলা যায় না। ভারতের মুঘল ইতিহাসে মুঘলদের রাজ্যসীমা হয়ত কেটে-ছেঁটে লিখতে হত। তা যা না হয়েছে তা নিয়ে আপাততঃ মাথা না ঘামালেও চলবে। তবে আমি যে বলেছি বাংলা বা মানসিংহ কেউ কাউকে ভুলতে পারে নি, তার অন্য কারণ রয়েছে। বলছি,

অম্বর রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গ দুটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। রাস্তা খুব একটা চওড়া নয়। যে দুর্গে সেনানীবাস সেটা খাড়া পাহাড়ের উপরে। নীচ থেকে দেখতে হলে মাথাটাকে একদম ভেঙে দেখতে হবে। ওখানকার এক গাইডের ভাষণে জানতে পারলাম রাণা প্রতাপ সিংহের সাথে বিবাদের ফলে মানসিংহকে সর্বদা সন্ত্রস্ত এবং প্রস্তুত হয়ে থাকতে হত। কখন কি হয়, কখন কি হয়, ভাব। তাছাড়া দুর্গটির অবস্থান ছিল ঠিক মূল দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে। যাতে করে শত্রু ফটক ভেঙে আক্রমণ করতে না পারে। দুটি দুর্গই অত্যন্ত মজবুত এবং সুরক্ষিত।

তৎকালীন সময় এসব দুর্গও কেবলমাত্র শত্রুর বাহুবলের কাছে পদানত হত। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। অত উঁচু খাড়া পাহাড়। তার উপরে গড়ে উঠেছে প্রাসাদ। প্রাসাদ আবার যেমন তেমন নয়। মোটা মোটা থাম, বড় বড় মার্বেল পাথর। ভাবি, কি করে তোলা হয়েছিল সে সময়। তাছাড়া যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে এমন সমস্ত অস্ত্র দেখেছি। সত্যি বলতে কি, ঘোরান তো দূরকা আস্তে চাগানই কষ্ট। আজকাল শক্তিধরদের কাছে ওয়েট লিফ্‌টিং-এর মত। ভাবুন কত অমিত শক্তির অধিকারী হলে ওটা নিয়ে যথেচ্ছভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুদ্ধ করা যায়।

আর আজকাল? মাত্র কয়েক পাউণ্ড ওজনের বন্দুক ঘাড়ে করে কিছুদূর গেলেই হাঁফ ধরে যায়। বিজ্ঞান যত এগোচ্ছে, মানুষের দৈহিক শক্তি তত ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। দেহকে আরাম দিলে দেহে লড়াইয়ের শক্তি কমে যায়। দেহে বাসা বাঁধে ব্যাধি। না, আর এসব প্রসঙ্গ নয়।

অম্বরের প্রাসাদ দুর্গে ঢুকেই বাঁদিক দিয়ে কিছুটা এগোলেই পাথরের বাঁধান খোলা চত্তর। সেটা পেরিয়ে আর একটু এগোলেই অন্দরমহলে যাবার রাস্তা। রাস্তা বলাটা বোধ হয় ভুল হবে। ধাপবিহীন সিঁড়ি, অনেকটা খাড়া হয়ে ছাতে গিয়ে পৌঁছেছে। ওটা ধরে এগোলেই বাঁদী মহল, রাণীমহল, মানসিংহের শোবার ঘর ইত্যাদি কক্ষে পৌঁছান যায়। সবই পাথরের। দামী মারবেল পাথরের তৈরী। ঐ মসৃণ সিঁড়ি যেখানে নেমে এসেছে সেখানেই মন্দির। মন্দিরের পরে চত্তর। মন্দিরের দেবী, বাঙলার দেবী। যশরেশ্বরী কালী। প্রতাপাদিত্যের উপাস্যা, মা যশোরেশ্বরী।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, মা এবং সন্তান দুজনকে ধরে নিয়ে আসেন। মা পাষাণময়ী, সন্তান রক্তমাংসে গড়া মানুষ। একজন খাঁচায়, অপরজন মাথায়। পাষাণ মাতৃমূর্তি স্থাপিত হবে নিজ রাজপ্রাসাদে। আর খাঁচায় পোরা রক্তমাংসের বীরপুত্র অর্পিত হবে আকবর বাদশার উপঢৌকন হিসাবে। এ অবস্থা মেনে নেয় নি বীর সন্তান। অপমানে ক্ষোভে দেহত্যাগ করেছেন তিনি। আজো বাঙলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে—

"যশোহর নগর ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম।
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ॥
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়।
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥"

প্রতাপাদিত্য চলে গেছেন যেখানে—মায়ের উপর অভিমান করে, মানসিংহও সেখানেই গেছেন। এমন কি আকবর বাদশাহকেও সেখানেই যেতে হয়েছে। কিন্তু রয়ে গেছেন মাতৃমূর্তি। পাষাণে গড়া মাতৃমূর্তি মা যশোরেশ্বরী। প্রতাপাদিত্যের

যশোরেশ্বরী, বাঙলার যশোরেশ্বরী। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম মাকে। মা সুখে আছেন কিনা?

এ মূর্তি যে বাঙলা থেকে আনা হয়েছে—সে কথা মন্দির গাত্রে লেখা রয়েছে। শুনলাম এখনও একজন বাঙালী পুরোহিত দিয়ে প্রত্যহ মাকে পূজো দেওয়া হয়। সকলেই ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করছে, প্রণামি দিচ্ছে। আমিও প্রণাম করলাম। মনে মনে বললাম—'মা, তুমি প্রতাপাদিত্যকে ত্যাগ করে এখানে কেন? তুমি যে তার লজ্জারূপে এখানে অবস্থান করছ।' মা যেন তিরস্কার করে কানে কানে বললেন—"তুই নির্বোধ, তুই অজ্ঞান, মা কি কখনও একার হয়? মা যে সকলেরই।" মনে মনে সান্ত্বনা পেলাম।

কতক্ষণ একইভাবে মায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম জানিনা। কানে এল একটি মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পিছন ফিরে তাকালাম, দেখি অঞ্জলি। এখানে কি করে এল ও। কাঁদছে কেন? একটু এগিয়ে কাছে গেলাম।

—তুমি অঞ্জলি না?

অঞ্জলি চটপট চোখটা মুছে ফেলে আমার দিকে তাকাল। আমাকে এ জায়গায় দেখতে পাবে ভাবে নি ও। অপ্রত্যাশিতভাবে আমার দেখা পেয়ে কিছুটা স্বস্তি, কিছুটা আশ্চর্য হয়ে যায়।—হ্যাঁ, আমি অঞ্জলি।

—তুমি এখানে কেন?

—আমি এখানে কেন, সে কথা বলতে অনেক সময় নেবে। সুযোগ পেলে পরে বলবো।

—তোমার স্বামী কোথায়? সেই—ভদ্রলোক, যাকে আজমীঢ়ে দেখেছিলাম।

—ও আমার স্বামী নয়।

—ও তবে কে?

—ওর নাম পৃথ্বীপাল সিং।

—তবে তুমি ওর সাথে ঘুরছ কেন? তোমার বাড়ী কোথায়?

—আমার বাড়ী বেনারসে। ওর সাথে বাধ্য হয়ে ঘুরছি।

মনে একটা সন্দেহ প্রথম দিন দেখাতেই দানাবেঁধে ছিল। অঞ্জলির কথায় কিছুটা রহস্যের গন্ধ পেলাম। অঞ্জলি আমার হাতটা ধরে অনুরোধের সুরে বললে,

—আমি বড় বিপদে পড়ে গেছি দাদা। আপনি আমায় বাঁচান।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

—তুমি বেনারস থেকে রাজস্থানে এলে কেন? আমায় সব খুলে বল। অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

—সব খুলে বলার মত সময় নেই। তবে সংক্ষেপে শুনুন। আমি হঠাৎ উত্তেজনার বশে একটা মস্তবড় ভুল করে ফেলেছি। আমার মনে হয় বর্তমানে আমি একটা খারাপ চক্রের হাতে পড়েছি। পৃথ্বীপাল লোকটা খুব মারাত্মক। ও না করতে পারে এমন কোন কাজ নেই। ওর পেছনে একটা দল আছে।

—ও এখন কোথায় ?

আমায় এখানে বসিয়ে রেখে খাবার আনতে গেছে। ও বলেছে ও আমায় নিয়ে আগ্রা যাবে।

—তোমাকে নিয়ে কবে আগ্রায় যাবে বলেছে কিছু।

হ্যাঁ। আগামী শুক্রবার।

আমি মনে মনে হিসাব করে নিলাম। আজ থেকে চার দিন পরে শুক্রবার। আমরাও ঐ দিন সকালে আগ্রায় পৌঁছাব। আমি বললাম,

—এই মুহূর্তে তো তোমায় আমি সাহায্য করতে পারব না। তুমি বরং একটা কাজ কর। কোন রকম কায়দা করে শুক্রবার বিকেলে তাজ দেখতে চলে আসবে। ওখানে আমার সাথে দেখা হবে।

—আমাকে আপনি দিল্লী পৌঁছে দিলেই হবে। সেখানে আমার আত্মীয় আছে।

—অথবা তুমি আমাদের সাথে আমাদের বাসায় আসতে পার।

—না। তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এখানে ওর লোকজন আছে। আপনাদেরও বিপদ হবে।

অঞ্জলি ঘুরে তাকিয়েই দ্রুত আমাকে বলল,

—দাদা আপনি সরে যান এখান থেকে। ও আসছে। আমি শুক্রবারে আগ্রার তাজের কাছে থাকব।

আমি একটু আড়ালে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, অঞ্জলি চটপট চোখ দুটো মুছে কৃত্রিম হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলল। আড়াল থেকে দেখে বুঝলাম মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। কিছুটা চালাকির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে। মনে উদ্‌বেগ থাকলেও কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একটি অসহায়া মেয়ে বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে বিপদে পড়েছে। আমার কাছে সে সাহায্য চাইছে। আমাকে সে দাদা বলে ডেকেছে। অথচ আমি কি করব ? ওরা কোথায় থাকে, কোথায় যাবে, কি করবে, কিসের চক্র, কিছুই জানিনা। সমস্ত চিন্তা মনের মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একবার ভাবলাম আমার দলের বন্ধু বান্ধবদের ডেকে ঘটনাটা বলি। আবার ভাবলাম অঞ্জলি যদি ঠিক বলে থাকে, তাতে ওর বিপদ বাড়বে এবং আমাদের গোটা দল একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে। অতএব ও ভাবনা পরিত্যাগ করলাম।

দ্রুত দুর্গের ছাদে গিয়ে উঠলাম। বায়নাকুলারটা বের করে দেখতে লাগলাম। ঐ তো—ঐ তো অঞ্জলিকে নিয়ে পৃথ্বীপাল টাঙায় করে এগিয়ে চলেছে, রাস্তা ধরে। অঞ্জলি হাসছে। পৃথ্বীপালের গায়ে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে। অবশেষে টাঙা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম না কিছুই। কিছুক্ষণ আগে কান্নায় ভেঙে-পড়া, সাহায্য চাওয়া। আবার একটু পরেই সব দৃশ্য পট পরিবর্তিত। হেসে লুটি-পুটি খাওয়া। গায়ে ঢলে ঢলে পড়া। না। কিছুই মিলাতে পারছি না। বায়না কুলারটা চোখ থেকে নামিয়ে স্থির হয়ে কিছুসময় দাঁড়িয়ে রইলাম।

পৃথিবী জোড়া অভিনয়। প্রতি মুহূর্তে অভিনয় চলছে। মুহূর্তে মুহূর্তে দৃশ্য পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর। যে যার গণ্ডীতে নায়ক নায়িকা। আমিও তাই। আর ভাবনা নয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিমে পাহাড়ের কোলে সূর্য ঢলে পড়ছে। তার লাল শেষ রশ্মি বিন্দু দুর্গ শীর্ষে এসে পড়েছে সাদা মসৃন পাথরের গায়ে। একটা কাক প্রাসাদ শীর্ষের গম্বুজের উপর গলা বাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে 'কা' 'কা' করে ডেকে চলেছে। ও যেন বলছে, আর কেন পথিক বর! অনেকক্ষণ তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছ। এবার নেমে যাও প্রাসাদ ছেড়ে। এ প্রাসাদে এবার ফিরে আসবে প্রাসাদের প্রকৃত অধিবাসীরা। রাজ পাট বসবে। নকিব হাঁকবে। নর্তকী গাইবে। সৈনিক যুদ্ধের কসরৎ করবে। বাঁদীদের ব্যস্ততা বেড়ে যাবে। দিন মানে তোমাদের ব্যাঘাতে। ওরা আসে না। এবার যাও। এবার ওরা ফিরে আসবে। টর্চ জালিয়ে নীচে নেমে এলাম। পেছনে রইল অম্বর দুর্গ প্রাসাদ।

দুর্গের প্রধান ফটক পেরিয়ে এসে বসে পড়লাম একটা পাথরের উপর। বাইরে থেকে বার বার দেখতে লাগলাম দুর্গ প্রাসাদকে। মনের পটে ভেসে উঠল ৫ টি একটা দৃশ্য। মহারাজ মানসিংহ বাংলার যুদ্ধ শেষ করে, বাদশাহ আকবরকে সন্তুষ্ট করে বিশ্রাম গ্রহণ করতে আসছেন নিজ প্রাসাদ অম্বরে। তার তোড়জোড় চলছে চারিদিকে। প্রতিটি দুর্গের অধিবাসী ব্যস্ত। মহারাজ আসছেন যুদ্ধ জয় করে। প্রধান ফটকে নহবত বসেছে। শানাই বেজে চলেছে হয়ত দরবারী কানাড়া রাগে। মঙ্গল শাঁখ, পুষ্প চন্দন, ফুলের মালা নিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরীরা। পুরোহিত মায়ের আশীর্বাদী ফুল এবং প্রসাদ নিয়ে অপেক্ষা করছে। সৈনিক, সেনাপতিগণ সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ ভাবে।

অবশেষে এলেন মানসিংহ। মহারাজ মানসিংহ। ফটকের রক্ষী হেঁকে উঠল। উন্মুক্ত হল প্রধান ফটক কড় কড় শব্দে। খটা খট, খটা খট শব্দে হাজার অশ্বখুড়োধ্বনি এসে থেমে গেল প্রধান ফটকের কাছে। বাহকের কাঁধে চড়ে এল দোলা। দোলায়

মা যশোরেশ্বরী। প্রতিষ্ঠিত হবেন মানসিংহের প্রাসাদে। যশোহরের যশোরেশ্বরী হবেন অম্বরের অম্বরেশ্বরী।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, যুদ্ধফেরৎ মানসিংহ অবসন্ন দেহে চলে গেলেন অন্দরে। নিজের মহলে। ইঙ্গিতে নর্তকীদের পাঠিয়ে দিলেন তিনি। দেহটাকে এলিয়ে দিলেন তিনি দুগ্ধ ফেননিভ নরম সজ্জায়। পানীয় এল। এল নানাবিধ খাদ্য। সাথে এলেন প্রধানা মহিষী। চন্দ্রালোকিত রজনীতে নীল আকাশের নীচে পরম আলস্যে চেয়ে আছেন মানসিংহ। দূরে কালো কালো আরাবল্লী পর্বত শ্রেণীর দিকে। দুটি দুর্গের সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে রয়েছে শুধু পাহারারত সৈনিকগণ। অস্ত্র হাতে ঘুরছে তারা একদিক থেকে অপর দিক। আর জেগে রয়েছেন মানসিংহ, আর তাঁর প্রধানা মহিষী। অস্ত্রক্ষত স্থানগুলিতে নরম হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন প্রধানা মহিষী। মানসিংহ বল্‌ছেন বাঙলা জয়ের কথা—প্রতাপাদিত্য জয়ের কথা। মাতা যশোরেশ্বরীর কথা। আমিও ভাবছি মাতা যশোরেশ্বরীর কথা। প্রতাপাদিত্যের মাতা যশোরেশ্বরী। বাঙলার মাতা যশোরেশ্বরী। বুকে মায়ের খড়্গের দাগ এখনও রয়েছে।

সন্ধি! না, সন্ধি প্রতাপাদিত্য করবে না মুঘলদের সাথে। মুঘলের বশ্যতা কিছুতেই স্বীকার করবে না। পরাধীনতার চাইতে মৃত্যু অনেক ভাল। বীরের মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধই তিনি করবেন। হোক মুঘলবাহিনী বিরাট, হোক তারা অপরাজেয়। আসুক প্রধান সেনাপতি মানসিংহ, যুদ্ধই তিনি করবেন। ইতিহাসে লেখা থাকবে বীর প্রতাপাদিত্যের নাম। আর তাছাড়া তার সহায় আছেন মাতা যশোরেশ্বরী।

—গুরুদেব, আপনি মায়ের পূজার আয়োজন করুন। মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করে আমি যুদ্ধে যাব।

প্রতাপ এলেন মন্দির প্রাঙ্গণে। কিন্তু একি! গুরুদেব অশুচি বসন পরে মায়ের পূজো দিচ্ছেন? গুরুদেবের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ক্রোধে-অভিমানে জ্ঞানহারা হয়ে চিৎকার করে উঠলেন প্রতাপাদিত্য।

—গুরুদেব, এ আপনি করছেন কি? অপবিত্র অবস্থায় মায়ের পূজো দিচ্ছেন? এ পূজো কি মা পাবেন?

গুরুদেবও নিজেকে সংযমের বাঁধনে বাঁধতে পারেন না। ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

—কি? তুই আমার পূজায় সন্দেহ প্রকাশ করছিস? এত অজ্ঞান, এত মূর্খ তুই? তবে দেখ, আমার পূজা মা গ্রহণ করেছেন কিনা।

মুহূর্তমধ্যে মায়ের হাতের খড়্গ নামিয়ে 'জয় মা, জয় মা' বলে বসিয়ে দিলেন

পাষাণময়ী রাজ রাজেশ্বরী, যশোরেশ্বরীর বুকে। দর দর করে তাজা টকটকে লাল রক্ত ঝরতে লাগল মায়ের বুক থেকে। ততক্ষণে গুরু এবং শিষ্য দুজনেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছেন মায়ের পদতলে। নিস্তব্ধ, নিঝুম চারিদিক। অন্দর মহলে উঠেছে ক্রন্দনের রোল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে গুরুদেব শিষ্যের মাথা কোলে নিয়ে বসে আছেন স্থির হয়ে। চোখে তার অপলক দৃষ্টি, তাকিয়ে আছেন মায়ের দিকে। হাতটা মৃদু বুলিয়ে দিচ্ছেন শিষ্যের মাথায়।

—ওঠ, এ যে মায়ের খেলা। তোর কি দোষ, এটাই তার নির্দেশ। নতুবা তোর মনে সন্দেহ আসবে কেন? কোনদিন তো আসেনি।

হাহাকার করে উঠে প্রতাপাদিত্য। কান্নায় লুটিয়ে পড়ে বীর সন্তান।

—অবশেষে তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে? কি অপরাধ করেছি মাগো? ফিরে আয় মাগো, ফিরে আয়।

সন্তানের হাহাকার ধ্বনি শুধু প্রতিধ্বনি তোলে নিস্তব্ধ, নিঝুম মন্দিরে। সান্ত্বনা দেন গুরুদেব।

—যেখানে সন্দেহ, সেখানে থাকেন না মা। মা যে জ্ঞান, মা যে বিশ্বাস। মা চলে গেলেন, সাথে নিয়ে গেলেন যশোহরের সৌভাগ্য। বাঙলার সৌভাগ্য। ধুমঘাটের যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ণীত হল। যশোহরের ভাগ্য রবি হল অস্তমিত। মাতৃহীন শিশু, হল শক্তিহীন। খাঁচায় পোরা সিংহ ক্ষোভে, দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন—মাতা যশোরেশ্বরীকে ধ্যান করে।

একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল মানসিংহের অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের বাস বার বার হর্ন দিয়ে ডাকছে আমায়। চিন্তা গেল ছিন্ন হয়ে। শেষবারের মত অম্বরের পানে তাকিয়ে প্রণাম করলাম মাতা যশোরেশ্বরীকে। তিনি আজ অম্বরের অম্বরেশ্বরী।

॥ সাত ॥

আগ্রা। তাজমহল। সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল, ভারতীয় স্থাপত্যের গৌরব তাজমহল। পৃথিবীর গৌরব, মানব জাতির গৌরব তাজমহল। এ শুধু শাহজাহানের স্বপ্ন শতদল নয়, এ শুধু স্মৃতি নয়, এ তাজমহল। ভাস্কর্যের, সৌন্দর্যের উড্ডীন পতাকা। যমুনা কিনারে মুঘল সাম্রাজ্যের চ্যালেঞ্জ তাজমহল। যতবার দেখেছি ততবার নতুনরূপে দেখা দিয়েছে। স্বপ্নে দেখেছি, চন্দ্রালোকিত রজনীতে দেখেছি, দেখেছি দিবালোকে। তাহলেও দেখা শেষ হয়নি। পত্নীপ্রেমের অবিনশ্বর সাক্ষ্য, শ্বেত শুভ্র, পরম বিস্ময় তাজমহল। কবির কল্পনা তাজমহল—এক মর্মর স্বপ্ন।

যখনই তাজমহলের ইতিহাস স্মরণ করি, আঁতকে উঠি তাজমহলকে দেখে। হাজার হাজার নিরীহ প্রজার রক্তে গড়া তাজমহল। দেখেছি শোষকের গড়া তাজমহল। তাজের বাতাসে ঘুরে বেড়ায় লক্ষ মানুষের দীর্ঘশ্বাস। ঘৃণা এসেছে মনে, প্রতিবাদ এসেছে কণ্ঠে। তবুও মন ভরে উঠেছে বিস্ময়ে—অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা তাজমহলকে দেখে। ওর গম্বুজ, ওর মিনার, ওর কারুকার্য অবাক হয়ে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। মনে ভাবি সৌধ পরে থাক, প্রবেশদ্বারগুলিও তো এক একটা মহাবিস্ময়।

যমুনায় এখন জল খুব কম। তাছাড়া দূরেও সরে গেছে কিছুটা। একদিন যখন যমুনা কূলে কূলে প্লাবিত হয়ে কল কল শব্দে বয়ে যেত, সেদিনের চন্দ্রালোকিত রজনীতে তাজের ছায়া পড়ত গিয়ে নদীর জলে। আপসোষ হয় সে দৃশ্য আর দেখতে পাব না বলে। তাজের গা থেকে দামী পাথরগুলি তুলে নিয়ে তাকে কিছুটা শ্রীহীন করার চেষ্টা হয়েছে। তাহলেও তাজ আজো তাজ। যে নারী অনন্যা, বনের ফুলে সাজালেও সে অনন্যা।

শুনেছি, যে ফুল, গান এবং শিশু পছন্দ না করে, সে হাসতে হাসতে মানুষকে হত্যা করতে পারে। ফুল সুন্দর, শিশু সরল সুন্দর, গান মনকে মোহিত করে—তিনটিই ভাল, তিনটিই সুন্দর। তাজ সুন্দর। তাই তাজকে ভাললাগে। যে তাজকে দেখেছে সেই তাজের সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে গেছে। আমিও প্রেমে পড়ে গেছি, তাই ঘুরে ফিরে আসি হেথা বারে বার।

সে দিন ও দলের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তাজকে। আমার দলের অনেকেই এই প্রথম তাজকে দেখছে। দল থেকে আলাদা হয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। চোখ দুটো সতর্ক হয়ে ঘুরছে অঞ্জলি কে দেখবার জন্য। সেই অন্তরে ওর

সাথে দেখা হবার পরে মনে করেছিলাম 'অঞ্জলি নাটক' এখানে শেষ। জনস্রোতে হারিয়ে গেছে একটি হতভাগ্যা নারী। মেয়েটি যদি সত্যি বিপদগ্রস্তা হয়ে থাকে হয়ত পালাতে চেষ্টা করেছে। পৃথ্বীপাল ওকে সরিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। নতুবা পাচার করেছে। এ ধরণের চক্রের কথা শোনা যায় প্রায়ই খবরের কাগজে।

আমার সমস্ত চিন্তাকে ভুল প্রমাণিত করে অঞ্জলি বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে আছে না, সেও এসেছে পৃথ্বীপালের সাথে এখানে। ঐ তো দূরে গাছের তলায় বসে আছে ও। আমায় দেখতে পেয়েই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল ও। অঞ্জলি ও হয়ত মনে মনে খুঁজছে আমায়।

—দাদা।

দ্রুত এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। বললাম,

—তুমি কতক্ষণ হোল এসেছ।

—আগ্রায় এসে পৌঁছেছি কাল সন্ধ্যায়। অনেক অভিনয় করতে হচ্ছে আমায়। এখানে আবার আর একটা লোকের সাথে ওকে ঘোরাফেরা করতে দেখছি। লোকটাকে দেখে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। লোকটা দু-তিনবার আমার কাছে এসে আলাপ করবার চেষ্টা করেছে। ওর চোখের দৃষ্টি আমার ভাল লাগছে না দাদা।

—পৃথ্বীপাল কোথায় ?

—ঐ লোকটাকে নিয়ে কোথায় যেন গেছে।

—পৃথ্বীপাল কি জানতে পেরেছে যে, তুমি পালাবার মতলব করছ ?

—না, আমি ওকে বুঝতে দিইনি। কিন্তু আর বোধ হয় সম্ভব হবে না। আমায় আপনি বাঁচান দাদা।

অঞ্জলির চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি,

—ভয় নেই। তুমি না বলছিলে দিল্লীতে তোমার আত্মীয় আছে ? সেখানে তোমায় পৌঁছে দিলে তুমি নিশ্চিন্ত ?

অঞ্জলি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার চোখে বলল,

—তা হলে খুব ভাল হয়।

—বেশ তাই দেখছি।

মুহূর্ত মধ্যে আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেল। ওর হাত থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে ঘড়িতে সময়টা দেখে নিলাম।

—তুমি এখানে বস। আমি আসছি এক্ষুণি।

বলেই হন হন করে এগিয়ে গেলাম আমার দলের কাছে। আমাদের দলে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক। সকলেই পুরুষ, পনের ষোল জন অল্প বয়স্ক যুবক ও রয়েছে। খুব

সংক্ষেপে তাদের বিষয়টা বুঝিয়ে দিলাম। তাদের কি করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলাম। দলের যুবকরা একটা কিছু রহস্যের গন্ধ রয়েছে বলে রাজি হয়ে গেল। বাদ সাধলেন সামু। আমাদের দলে সামুর বয়সটাই একটু বেশী আমাদের চাইতে। নিরীহ বেচারা। খুব আনন্দ প্রিয়। কারো সাতে পাঁচে থাকে না একটু ভীতুও বটে। আমায় বলল,

—আবার কি ফ্যাসাদ বাধালে বলতো ? তোমার সবটাই উদ্ভট।

আমি হেসে বললাম,

—তোমার কোন ভয় নেই। ওরা শুধু মেয়েটিকে দূর থেকে নজরে রাখবে। গেট অবধি পেছনে পেছনে যাবে। কোন লোক যদি বাধা দেয় পুলিশ ডাকবে। আর আমি গাড়ী নিয়ে গেটে অপেক্ষা করব। এক জন আমায় খবর দেবে। আমি ম্যানেজ করব। আর যদি ঝামেলা না হয় তবে তোমরা গেট থেকে ফিরে আসবে। আমি ওকে দিল্লীতে ওর আত্মীয়দের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে চলে আসব। তোমরা আমার জন্যে দিল্লীর কালী বাড়ীতে ওয়েট্ করবে। বুঝেছ।

আর আপত্তি করল না সামু। শুধু একবার বলল,

—দেখ বাপু, ঝামেলা হলে কিন্তু আমি নেই তাতে।

সামুর বলার ভঙ্গি দেখে সকলেই হেসে দিল। আমি বললাম,

—ঝামেলা হলে যে তুমি কেটে পড়বে তা আমরা জানি, ভয় নেই। ফিরে গেলাম অঞ্জলির কাছে। দ্রুত তাকে বুঝিয়ে দিলাম সব। বললাম এখন থেকে তিন চার মিনিট পরে সে গেটের কাছে এগিয়ে যাবে। আমি তিন রাস্তার মোড়ে যেখানে গাড়ি দাঁড়ায় সেখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব। আমি হাত ইসারা করতেই অঞ্জলি গাড়ি চড়ে বসবে। চারি দিকে ভাল করে দেখে নিলাম পৃথ্বীপালকে দেখা যায় কিনা। না ও বেটার পাত্তা নেই। কিন্তু এসে পড়তে কতক্ষণ। সুতরাং চট্পট কাজ সারতে পারলে খানিকটা বাড়তি সুযোগ পাওয়া যাবে। হন্ হন্ করে এগিয়ে চললাম গেটের কাছে।

যাক। বেশী ঝামেলা করতে হল না। গেট থেকে বেড়িয়ে একটু অপেক্ষা করতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার একজন পাঞ্জাবী। ভাড়াটা একটু চাইল বটে। আমিও আর দরকষাকষি করলাম না। পাছে হাত ছাড়া হয়ে গেলে টাঙা ছাড়া উপায় থাকবে না। টাঙা নিলে কিছুটা ঝুঁকি থেকে যাবে। তা ছাড়া টাঙায় করে তো আর দিল্লী যাওয়া যাবে না। ট্যাক্সির দরজা খুলে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরে দলের আগে আগে অঞ্জলি এল। আমি হাত ইসারা করতেই ও গাড়ির

মধ্যে বসে পড়ল। আমি সরদারজীকে চালাতে বলে বসে পড়লাম। গাড়ি ছেড়ে একটু এগোতেই দেখি পৃথ্বীপাল এবং অপর একজন লোক চিৎকার করতে করতে এই দিকেই এগিয়ে আসছে 'এই রোখো—এই রোখো' বলে। অঞ্জলি ভয়ে 'দাদা' বলে আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরল। আমি অঞ্জলিকে 'ভয় নেই' বলে সরদারজীকে হাঁক দিলাম 'জলদি চলো সরদারজী।' সরদারজী কি বুঝল জানি না ওদের দিকে একবার তাকিয়ে, একটু মুচকি হেসে একসিলেটারে চাপ দিল। গাড়ি উল্কার বেগে এগিয়ে চলল। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম পৃথ্বীপাল হাত পা ছুঁড়ছে। মনে হল অশ্রাব্য ভাষায় গাল মন্দ করছে।

আমি হেসে বললাম,

—অঞ্জলি তোমার পৃথ্বীপাল 'চিড়িয়া ভেগেছে' দেখে, দেখ কেমন করছে?

অঞ্জলি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গাড়ি তখন অনেক-দূর। পেছনে, অনেক পেছনে পড়ে রইল পৃথ্বীপাল।

গাড়ি এ মোড় সে মোড় ঘুরে অবশেষে মেইন রোডে পড়ে ছুটে চলেছে। এতক্ষণ অঞ্জলির দিকে তাকাবার অবকাশ হয় নি। এবার অঞ্জলির দিকে ঘুরে বললাম,

—এবার তো নিশ্চিন্ত। বল তোমার সব ঘটনা।

চেয়ে দেখি অঞ্জলিব বড় বড় ডাগর ডাগর চোখ দুটি থেকে অনবরত নেমে যাচ্ছে জলের ধারা।

—কাঁদছ কেন? এবার তো তুমি মুক্ত।

অঞ্জলি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল,

—দাদা, আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।

ওকে বাধা দিয়ে হেসে বললাম,

—শোধ করতে না পার, কর না, ও সব পরে হবে। এখন তোমার কথা বল।

অঞ্জলি বলে চলেছে তার দুঃখের কথা, তাব জীবনের করুণ কাহিনী। অঞ্জলি জন্মনেবার আগেই ওর বাবা কাশীবাসী হন। ওদের আদি বাড়ি ছিল পূর্ব বঙ্গের কোন এক জায়গায়। অঞ্জলি তা বলতে পারে না। অঞ্জলির জ্ঞান হবার পরে দেখেছে বাবা আর মাকে। বাবাকেও বেশী দিন দেখেনি। বাবার মৃত্যুর পরে ওর মা বিশ্বনাথদের বাড়ীতে কাজ করতেন। দুটি পরিবার এমন ভাবে মিশে যায় যে, বাইরে থেকে ওরা যে আলাদা, তা বোঝা, যেতনা। বিশ্বনাথের বাবা মা অঞ্জলিকে খুব স্নেহ করতেন। অঞ্জলি কে কলেজ অবধি পড়িয়েছেন। আর এই কলেজে পড়াই হল অঞ্জলির কাল।

অঞ্জলি তার কিছু বন্ধু এবং বান্ধবী কে নিয়ে একদিন বেড়াতে যায় রামগড় দুর্গে। অঞ্জলি পৃথ্বীপালকে আগে কোন দিন দেখে নি। পৃথ্বীপাল বেনারসের লোক নয়।

বেনারসে থাকেও না। ও এসেছিল বেনারসে বেড়াতে ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে। সেই বন্ধুর সুবাদে ঢুকে পড়ে অঞ্জলিদের দলে। সকলেই জানত পৃথ্বীপাল খুব বড় ঘরের ছেলে। শিক্ষিত এবং ভদ্র। আসলে যে ও একটা মানুষরূপী জানোয়ার, তা যদি জানত, তবে কি অঞ্জলি মিশতো ওর সাথে—অত অন্তরঙ্গ ভাবে।

অঞ্জলি বার বার বিশ্বনাথ কে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। বিশ্বনাথ যেতে রাজী হয়নি, বিশ্বনাথ ভীষণ লাজুক প্রকৃতির ছেলে, ও কারো সাথে বড় একটা মেশে না। ওর বন্ধু বান্ধব ও খুব কম। বিশ্বনাথ ছবি আঁকতে খুব ভাল বাসে। সময় পেলেই ছবি আঁকে নয়ত বই পড়ে। পড়াশুনায় বিশ্বনাথ খারাপ নয়, বেনারস ইউনিভার সিটির দর্শনের ছাত্র।

অঞ্জলি একটু দম নেয়।

—আপনার ওয়াটার ব্যাগে জল আছে দাদা?

খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করে।

রামগড়। রামগড় দুর্গ বেনারস থেকে বেশী দূরে নয়। গঙ্গার পূর্বপারে গড়ে উঠেছে এই দুর্গ। অনেক বার গেছে অঞ্জলি সেখানে। সকলে মিলে হৈ হৈ করে দেখছে দুর্গ। অঞ্জলি মহাউৎসাহে পৃথ্বীপালকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে প্রতিটি কক্ষ। পৃথ্বীপালের নজর কিন্তু সে দিকে নয়। ওর লোভাতুর দৃষ্টি লেহন করছে অঞ্জলির উন্নত যৌবনকে। সাথীরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। একটা নির্জন কক্ষে অঞ্জলি পৃথ্বীপালকে বলছে রামগড়ের ইতিহাস। পৃথ্বীপাল নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না, ঝাঁপিয়ে পড়ে অঞ্জলির দেহটার উপরে। অঞ্জলি বাধা দিতে গিয়েও পারে না। ঝড়ের আঘাতে প্রস্ফুটিত কুসুম হয় বৃন্তচ্যুত। অঞ্জলি ডুকরে কেঁদে উঠে।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। কোন সান্ত্বনার বাণী আসছে না আমার গলা থেকে। হায় বিধাতা! সুন্দর কুসুম তোমারই দান। আর কীটও তোমারই দান। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা গাড়ির মধ্যে। অঞ্জলি কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কাঁদুক অঞ্জলি, কাঁদুক এমন করে কতশত অঞ্জলিই তো অহরহ কাঁদছে। কে তার খবর রাখে?

কি অদ্ভুত রহস্যে ভরা এই বসুধা। এর রঙ্গমঞ্চে কত ট্রাজেডীর নাটক অভিনীত হচ্ছে অহরহ। অঞ্জলি কাঁদছে কীটদষ্ট হয়ে, বিশ্বনাথ কাঁদছে অঞ্জলিকে না পেয়ে। মা কাঁদছে মেয়ের জন্যে। কান্না। আর কান্না। সকলেই কাঁদছে, আকাশ কাঁদছে। বাতাস, কাঁদছে। সকলের অশ্রু নিয়েই কি গঙ্গা-যমুনার স্ফীত হয়ে কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে দিনরাত। দুনিয়া জোড়া এ কান্না কবে থামবে? কবে আকাশে বাতাসে বয়ে যাবে খুশীর জোয়ার? সে দিন কি আসবে না বিশ্বে?

বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি আনমনে। আকাশে তখন অসংখ্য তারার দল ঝিক

ঝিক করে জলছে, মনে হয় ওরা হাসছে। হাসি তা হলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়নি। হাসি আছে, হাসি থাকবে। কান্নাও থাকবে। হাসি কান্না নিয়েই রঙ্গভরা দুনিয়া। কান্নার পরেই হাসি, হাসির পরে কান্না, ওরা দুজনে হাতে হাত ধরে চলেছে। ট্রাজেডি আর কমেডি, কমেডি আর ট্রাজেডি। ঘুরে ফিরে আসে ওরা।

'চক্রানি পরিবর্তনতে দুঃখানিচ সুখানিচ।'

এর পরে ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঘরে বাইরে উঠল ঝড়। সে ঝড়ের আঘাতে অঞ্জলি এবং অঞ্জলির মা গেল ভেসে। বিশ্বনাথরাও রেহাই পেল না। তাদের ঘরও ভেঙে পড়ল। কথাটা চাপা থাকেনি বেশীদিন, বিশ্বনাথের বাবার কানে যেতেই ওদের বিয়ে ভেঙে দিলেন। মা লজ্জায় অপমানে অন্নজল ত্যাগ করলেন। অঞ্জলি ঘরে বাইরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে মা গঙ্গার বক্ষকেই শান্তির আশ্রয় বেছে নিল।

আত্মহত্যা করতে পারল না অঞ্জলি, বিশ্বনাথ ওকে বাধা দিল।

—এ তুমি করতে পারবে না।

—তুমি আমার মরতে বাধা দিলে কেন? সব জেনে শুনে তুমি আমায় গ্রহণ করবে? তুমি গ্রহণ করলেও তোমার বাবা, মা তো আমায় গ্রহণ করবেন না।

—না, এখন আর তা হয় না।

—তবে মরতে দিচ্ছ না কেন?

—মরে তুমি নিজের ব্যাথা জুড়াতে পার। কিন্তু আমার ব্যাথা?

—অর্থাৎ আমায় বাঁচিয়ে রেখে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? কিন্তু কেন? আর কেউ না করুক, অন্তত তুমি তো বিশ্বাস কর আমি এ অপরাধের জন্যে দায়ী নই।

—বিশ্বাস করি।

—তবে তোমার গ্রহণ করতে বাধা কোথায়?

—বাধা আছে। সে তুমি বুঝবে না। এখন আর তা হয় না।

—তবে তুমি কি চাও?

—আমি কিছুই চাই না এই মুহূর্তে। আমি চাই তুমি নিজেকে ফিরে পেয়েছ।

অদ্ভুত শান্ত অথচ দৃঢ় বিশ্বনাথের গলার স্বর। অঞ্জলি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। তারপরে হঠাৎ অঞ্জলি খিল খিল করে হেসে ওঠে। দৃপ্ত ভঙ্গিমায় রুখে দাঁড়ায় অঞ্জলি। মনে দারুণ জিদ চেপে যায়। নারীত্বের অহমিকায় আঘাত পেয়ে ফুঁসে উঠে আর এক অঞ্জলি। অন্ধকারে তখন ওর চোখ দুটো জলছে।

—বাঃ! চমৎকার। সমাজ আমাকে দেখে করবে উপহাস। দেবে টিটকিরী। ঘরে পাব লাঞ্ছনা। আর তুমি দূরে থেকে করবে তা উপভোগ? না, এ আমি হতে দেব না। তোমাকেও আমি আমার আগুনে পুড়িয়ে মারব। আমি পৃথ্বীপালের

কাছে ফিরে যাব। ও দেবে আমায় ঘর, দেবে আমায় সম্মান। ওকে নিয়ে আমি বেনারস ছেড়ে চলে যাব সেও ভাল, তবু তোমার কৌতুক আমি সইতে পারব না, কিছুতেই না।

বিশ্বনাথ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অঞ্জলির কথায়। অন্তর ওর হাহাকার করে উঠেছিল। একি সেই অঞ্জলি, না অঞ্জলির ছায়া। বিশ্বনাথ নিজেকে ফিরে পেতে একটু সময় নিয়েছিল।

—বেশ, তাই যাও। সেটা যদি তোমার সম্মানজনক বলে মনে কর।

বিশ্বনাথের এই নিস্পৃহ মনোভাবে অঞ্জলির মনে জিদ চেপে গিয়েছিল। নিজের বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অন্ধকারে। পৃথ্বীপালের উপর ওর প্রচণ্ড ঘৃণা। পৃথ্বীপালকে মনে করে নরকের কীট। তা সত্ত্বেও বেছে নিয়েছিল এই পথ। সেই রাতেই অঞ্জলি দেখা করেছিল পৃথ্বীপালের সাথে। পৃথ্বীপাল এইটাই আশা করছিল। ও অঞ্জলিকে ঘরছাড়া করার জন্যে দিয়েছিল মিথ্যে আশা। অঞ্জলি ছাড়ে ঘর, আজ কুড়িদিন ঘরছাড়া। অবশেষে অঞ্জলির মোহভঙ্গ হয়েছিল। আমার মনে একটা প্রশ্ন বার বার উদয় হচ্ছিল। আমি বললাম,

—ও কি আর তোমায় অপমান করার চেষ্টা করেছিল।

—হ্যাঁ, তবে চালাকি করে, অভিনয় করে, ভয় দেখিয়ে ওকে আমি ঠেকিয়ে রেখেছিলাম।

—যাক্, ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন।

ফুঁসে উঠল অঞ্জলি,—ভগবান? ঐ ভগবানের কথা আমায় বলবেন না দাদা। ভগবান আমায় কি দিল? আমার সব কেড়ে নিয়েছে, আমার সব।

আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে ও।

আমি মনে মনে হাসলাম—ভগবানের দুর্দশা দেখে। সকলকেই পুরো দিতে হবে। একটু কম দিলে চলবে না, একটু উনো দিলে চলবে না। আমরা যা চাইবো তাই দিতে হবে সাথে সাথে। শুধু দিতে হবে, দিতে হবে। নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হলে ও ব্যাটাকে ফকির হতে হবে—দিতে দিতে। নতুবা রক্ষা নেই। একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বলি। ধরুন আমার ইচ্ছা বাঘকে মারা। আর বাঘের ইচ্ছা আমায় আহার করা। দুজনেই আমরা ভগবান ভক্ত। দুজনেই আমাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম। ভগবান যদি বলেন 'তথাস্তু' এবারে তাহলে কি হবে ভাবুন? তার চাইতে কানে খানিকটা তুলো গুঁজে, নাকে খাঁটি সরষের তেল দিয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে অঘোরে নাক ডেকে ঘুমাক ভগবান অনন্ত কাল ধরে। আমিও ঘুমাই সেই সাথে।'

আট

আগেই বলেছি হরিদ্বারের ঘুম বড় মারাত্মক। ভয়ানক ছোঁয়াচে। আমার মনে হয় যাদের ঘুম ভাল হয় না, তারা যদি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে হরিদ্বারে আসেন, বেশ আরাম করে ঘুমিয়ে নিতে পারেন। আমি ডাক্তার হলে নিদ্রাহীন রুগীদের 'হরিদ্বার যাও' প্রেসক্রাইব করতাম। এখানকার হাওয়া সর্বদা উত্তর দিক থেকে ঝির ঝির করে বইছে। কিছু যদি দর্শন নাও করেন, কেবলমাত্র গঙ্গায় অবগাহন স্নান, আর পড়ে পড়ে ঘুম। ব্যাস, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে ঝর ঝরে নূতন দেহ, নব কলেবর যাকে বলে। বিশেষ করে আমার মত আলসে কুঁড়ে লোকেদের পক্ষে। আমি ঘুমের ভক্ত, ঘুমোতে আমি খুব ভালবাসি।

গত রাত্রে বেশ কিছুটা সময় অঞ্জলির চিন্তায় কেটে যাওয়ায় ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে গেল। মনে ভেবেছিলাম খুব ভোরে উঠে পালাব। কিন্তু তা আর হল না। ঘুম থেকে উঠে দেখি, অঞ্জলি বিশ্বনাথ মুচকি মুচকি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। বিশ্বনাথ আমায় বলল,

—উঠুন দাদা। অনেক বেলা হয়ে গেল। বাথরুম থেকে এসে চা খান।

নিজের উপর খুব রাগ হল। কেন ভোরে উঠতে পারলাম না, তাহলে তো এরা আমার নাগাল পেত না। বলে কয়ে এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। যদিও এদের আদর-যত্নের কোন ত্রুটি নেই, অভাব নেই আন্তরিকতার। তাহলেও আমি কোথাও বাঁধা পড়তে চাই না। আমি যে পথের মানুষ, অবহেলা অনাদর আমার সয়। খুব আদর-যত্ন আমায় সঙ্কুচিত করে। যা হোক পালান যখন হলই না তখন এদের কথাই শুনতে হবে। আমি বললাম,

—তোমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে?

বিশ্বনাথ বললে,—তা কি করে হয়। আপনাকে ছেড়ে আমরা খেতে পারি? উঠুন, চা খেয়ে গঙ্গায় যাব।

আমি হাই তুলে বিছানা ত্যাগ করলাম। অঞ্জলি আব্দারের সুরে বলল,

—বাথরুমে সব দেয়া আছে। দাড়িটা কেটে আসেন। চেহারাটা কি করেছেন, দেখেছেন একবারও।

আমি হেসে নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম,

—না, সে সময় পেলাম কখন?

—হরিদ্বারে কতদিন হল এসেছেন ?

—মনে নেই তো। দাঁড়াও আগে বাথরুম থেকে আসি। তারপরে হিসাব করে বলবো।

আমার কথা শুনে ওরা দুজনেই হাসতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়া গঙ্গায় স্নান এবং গল্পে দুপুরটা গড়িয়ে গেল। বিশ্বনাথ প্রস্তাব করল,

—দাদা, কনখলে একা আমি দুই তিনবার গেছি। অঞ্জলি একবারও যায়নি। চলুন আজকে আমরা কনখলে যাই। আপনাকে নিয়ে একবারও যাইনি।

কনখল আমারও ভাল লাগে। মুখে সেটা প্রকাশ করলাম না। হেসে বললাম,

—তোমাদের সাথে আমার দেখা মাত্র দুদিন হল। এর মধ্যে যাবার সুযোগ কখন এল। তোমার বক্তব্য বুঝেছি। বেশ চল। আমার কোন আপত্তি নেই।

অঞ্জলি হাততালি দিয়ে বলে উঠল,

—কি মজা, কি মজা। আপনার কাছ থেকে কনখলের কথা শোনা যাবে।

বিলটু একটা বেলুনকে বল কল্পনা করে সপাটে লাথি মারছিল অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ সেটা শব্দ করে ফেটে যাওয়াতে, বিলটু প্রথমে থমকে দাঁড়াল। তারপরেই খিলখিল করে হেসে হাততালি দিতে লাগল। অঞ্জলি হেসে বলল,

—বিলটুও আমাকে হাততালি দিয়ে সমর্থন করল।

—কনখলে গিয়ে আমিও ঐ বেলুনের মত ফেটে যাব। অর্থাৎ কিছুই বলতে পারব না। তোমরা মনে করবে দাদাও একটা বেলুন।

অঞ্জলি আমার হাত ধরে একটা হেচকা টান দিয়ে বললে,

—আগে উঠুন তো। তার পরে বোঝা যাবে।

—বেশ তাই দেখ।

কনখল, হরিদ্বারের আর একটি দর্শনীয় স্থান। হরিদ্বার থেকে সামান্য কম বেশী ৩ কিলোমিটার দূর, হরিদ্বার থেকে টাঙ্গা যায়, রিক্সায় করে যাওয়া যায়। তিন চাকার টেম্পো প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করেও যাওয়া যায়। হরিদ্বারের টাঙ্গা সম্পর্কে আমার একটু অন্যরকম ধারণা আছে। ওরা অনেকেই তীর্থযাত্রীদের সহায়তার পরিবর্তে হয়রানিটাই বেশী করে। যদি তারা মনে করল, পার্টি নতুন অথবা সাদাসিদে, নিরীহ, ব্যাস, পেয়ে বসবে। এই বিষয়ে ওরা একটা অলিখিত নিয়ম মেনে চলে। নিজেদের মধ্যে একটা যোগাযোগ রেখে চলে। এক জনের সাথে যদি কোন যাত্রীর ভাড়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হল; হয়ত টাঙ্গাওয়ালাই অন্যায় বলেছে, তা হলেও ওরা তার পক্ষ সমর্থন করে। অনেক সময়ে দেখেছি স্থানীয় যারা, বা দোকানদারগণ নীরব থেকে বুঝিয়ে দেয় সমর্থনটা ওদের দিকেই। অথচ এই তীর্থযাত্রীরাই হরিদ্বারের এ্যাসেট।

এরা হরিদ্বারে না এলে, দোকানদার বলুন, রিক্সা চালক বলুন, হোটেল বলুন, আর টাঙ্গা টেম্পোই বলুন, সব অচল হয়ে যাবে। এদের পেটের অন্ন যোগাচ্ছে এই যাত্রী-সাধারণ। এটা ওরা বোঝে না। ওদের কিন্তু ইউ, পি, সরকারের তরফ থেকে বোঝান উচিত। কেন না, ইউ, পি, সরকারও প্রচুর অর্থ উপার্জন করে টুরিষ্ট ব্যবস্থা থেকে। সরকার থেকে টুরিষ্ট বা তীর্থযাত্রীদের সুখ-সুবিধের উপর কতটা নজর দেওয়া হয়, তার সম্যক পরিচয় আমি পাইনি। করছে হয়ত।

হরিদ্বার স্টেশন থেকে সামান্য কয়েক পা উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখা যায় শিবের মূর্তি। এখান থেকেই ডান দিকে সোজা চলে গেছে কনখলের রাস্তা। হেঁটে গেলে অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। যাদের সময় কম বা হাঁটতে পারেন না তারা অশ্বযানেই যান বেশীর ভাগ। অনেকে আবার আসা যাওয়ার চুক্তি করেন। এতে কিছুটা অসুবিধা আছে। টাঙ্গাওয়ালা যাত্রী নেবার সময় খুবই আগ্রহ দেখাবে। তার পরেই সামান্য কিছু দর্শন করিয়েই ফেরার তাগিদ দিতে শুরু করে। নতুন যাত্রীরা অভিজ্ঞতার অভাবে ফেলে আসেন অনেক দর্শনীয় স্থল। এমন অনেকে আছেন, যাদের ক্ষেত্রে আর হয়ত আসা হবে না হরিদ্বারে, তাদের পক্ষে মস্ত বড় লোকসান এট আর যারা, 'এলাম গেলাম' এর দলে, অর্থাৎ সকলকে বলতে হবে, আমি হরিদ্বার গেছি, তাদের ক্ষেত্রে আমার বলার কিছু নেই।

কনখল। হরিদ্বারের কনখল। ইতিহাস এবং প্রাচীন ঘটনা বিজড়িত কনখল, ইতিহাস এরা যতটা নয় প্রাচীন ঘটনা তা অপেক্ষা অনেক বেশী। পুরাণ বিজড়িত কনখল। প্রকৃতপক্ষে কনখলের এই স্থানটাকেই নাকি মায়াপুরী বলা হত।

অঞ্জলি, বিলটু, বিশ্বনাথ এবং আমি এসে দাঁড়াই সতীঘাটের গঙ্গার পারে। অঞ্জলি অপেক্ষাকৃত নির্জন গাছের তলায় বসে পরে। আমি এবং বিশ্বনাথও তাকে অনুসরণ করি।

—দাদা এই সতীর ঘাট নামটা আমার খুব ভাল লাগে।

—লাগবেই তো। এখানে তো তোমাদের গৌড়বের পতাকা উড়ছে।

বিশ্বনাথ আমার মুকের দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে ছিল। বুঝতে পারলাম বিশ্বনাথ এবার আমায় কোন প্রশ্ন করবে। তাই আগেভাগেই দিশ্বনাথকে আমি বললাম,—বিশ্বনাথ, তুমি এবার আমাদের কনখলের কিছু ইতিহাস শোনাও।

বিশ্বনাথ হাত জোর করে হেসে বললে,—দাদা এরকম তো কথা ছিল না। তাছাড়া আমি ইতিহাসের ছাত্র নই, আমি দর্শন নিয়ে একটু আধটু পড়েছি মাত্র। আমি ইতিহাস কি করে বলবো ?

—তার মানে, তুমি বলতে চাইছ দর্শন পড়লে ইতিহাস জানা যায় না।

—না। তা ঠিক নয়, তবে আপনি বললেই ভাল হত।

—ওসব হবে না। তোমার মুখ থেকেই শুনব।

—বেশ চেষ্টা করছি। তবে দাদা আমি আগেই বলে রাখছি, আমি কিন্তু খুব সামান্যই জানি।

—বেশ, তাই বল।

অঞ্জলি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল,

—ও বলবে ইতিহাস। আর আপনি বলবেন পুরাণের কথা।

আমি বললাম,—আর তুমি ?

—আমি আর বিলটু শুনবো।

—ভাল শ্রোতা বটে।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। বিলটু অঞ্জলির কোলে আপন মনে খেলছিল, আমাদের হাসি দেখে ও বোকার মত হাসতে লাগল। আমি বললাম,

—নাও এবার শুরু কর।

বিশ্বনাথ একটু নড়ে চড়ে বসে বলতে শুরু করল।

—আমি যতটুকু জানি বা শুনেছি—হরিদ্বার এবং কনখল বহুপ্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছে। তবে যতটুকু এর প্রাচীন ইতিহাস, বইপত্র বা ধর্মীয় পুস্তক থেকে পাওয়া যায় তা সংক্ষেপ করে বলতে গেলে বলতে হয় আর্যরা তাঁদের প্রভাব বাড়াবার সাথে সাথেই হিমালয়ের প্রতি তাদের নজর পড়ে। তাঁরা এগিয়ে আসেন ক্রমেই উত্তরে। হিমালয় এবং গঙ্গা যমুনার আকর্ষণ তাদেরক বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট করে। এইরকম শোনা যায় যে পৌড়িয় রাজপুতনেতা মন্দাস্বর কনখলে বাস করতেন। মন্দাস্বরের বহু আগে থেকেই আর্যপ্রভাব এদিকটায় পড়েছে। মন্দাস্বরের পুত্র রাজা ঈশম সিং প্রায় শপ্তদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে কোন কারণে এখানে এসে হরিদ্বার শহরের পত্তন করেন। এই বংশের বেশ কয়েকজন রাজা এতদ্ অঞ্চলে বেশ কিছুকাল ধরে রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্বশেষ রাজার যে উল্লেখ পাই তার নাম বেণু সিং। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং ধার্মিক। এই বংশের আমলে গঠিত তিরনির ভবন এবং তাদের গড়ের ধ্বংশাবশেষের চিহ্ন আজো মায়াপুরে দেখতে পাবেন। এইটুকু বলেই বিশ্বনাথ চুপ করে যায়। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম,

— তারপর।

বিশ্বনাথ একটু মুচকি হেসে আবার বলতে শুরু করল।—পৌড়িয় রাজপুত রাজত্ব শেষ হলেও এখনও সাহারানপুর জেলায় প্রচুর পৌড়িয় রাজপুতদের দেখা যায়।

এছাড়া আর একটা দিক আলোচনা করা যায়। হিমালয়ের পাদভূমি নিয়ে একটা

বিস্তৃত অঞ্চলকে বলা হত ব্রহ্মপুরা। এককালে চন্দ্র বংশীয় রাজা অজয়পাল এবং তাদের গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে ব্রহ্মপুরার উপরে আধিপত্য রেখে চলেন। তিব্বতের লামা এবং নেপালের গুর্খাদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছিল গাড়োয়ালদের। ভারতে তখন ইংরেজদের রাজত্ব চলছে। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে গাড়োয়ালদের পক্ষ সমর্থন করে। ফলে গুর্খারা হেরে যায়। কিন্তু সে আলাদা ইতিহাস। কনখলে তার কতটা প্রভাব পড়েছিল সে কথা আমি বলতে পারব না। তবে আকবর বাদশাহ হরিদ্বারের হিন্দু সংস্কৃতির উৎসাহ দান করলেও পরবর্তীকালে মুঘল অত্যাচার থেকে কনখল বা হরিদ্বার বাদ যায়নি। এর চিহ্ন কনখল বা হরিদ্বার আজো আছে। যেমন ভেখ আখড়া, কাংরা মন্দির ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ থেমে যায়। আমি হাসি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। অঞ্জলি আমার হাসি লক্ষ্য করে বলল,

—আপনি হাসছেন কেন দাদা?

—দর্শন কেমন ইতিহাস বললে, শুনলে না?

বিশ্বনাথ লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করল।

ইতিহাস নিয়ে চুল চেরা বিচার বিশ্লেষণ করা আমার কাজ নয়। ইতিহাস নিয়ে আমি গবেষণা করছি না। ওটা যাদের কাজ তারা করছেন। তাঁরা যুক্তি তুলছেন। তর্ক করছেন। করছেন চুলচেরা বিচার। তারা করুক। তারা পোষ্টমরটম করুক জায়গা খুঁজে। অথবা পুরান তালপাতার পুঁথির উপর লেন্স লাগিয়ে। সত্য হোক উদ্‌ঘাটিত—মানবের মাঝে।

আমার মন কিন্তু ততক্ষণে পাখা মেলে উড়ে গেছে আরো পেছনে, দূরে আরো দূরে। কাল থেকে কালান্তরে। ইতিহাস থেকে পুরাণে। আমার যেন ভাবতে ভাল লাগছে, ঐ নোনা বালি ঝড়া পুরান প্রাসাদ দেখে, ওটাই দক্ষের প্রকৃত প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদকে, আমার মনের কল্পনা আর বিশ্বাসের উপর ভর করে, সাজাই মনের মত করে। এই যে গঙ্গার পারে, বটের ছায়ায় বসে আছি, এখানেই যেন মহারাজ দক্ষের যজ্ঞ সভা বসেছে। আসছেন হাজার হাজার মুনি, ঋষি। আসছেন দেব দেবীগণ। শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আজকের এই কনখলে।

অন্দর মহলের কোন এক ঘরের কোণে, হয়ত মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন মাতা, কন্যার বিরহে। সকলেই এসেছে। আসেনি শুধু সতী। দক্ষের ছোট কন্যা সতী। বড় আদরের কন্যা। দক্ষ সতীকে ভালবাসতেন খুব। কিন্তু আজ? এতবড় যজ্ঞ। কত দেবতা, কত দেবী, নাচ গান আনন্দ খুশীর জোয়ার। অথচ নেই সতী, দেবতাদের আরাধ্যা-মাতা সতী। আর আসেননি দেবাদিদেব মহাদেব।

আসেবেন কি করে? তাকে তো নিমন্ত্রণ করা হয়নি। এ যে শিবহীন যজ্ঞ। এমনকি পিতা ব্রহ্মা বোঝালেন দক্ষকে। মঙ্গলের দেবতা শিব। শিবহীন মঙ্গল হতে পারে না। কোন কথাই শুনবেন না তিনি শিবকে বাদ দিয়েই যজ্ঞ করবেন মহারাজ দক্ষ। বিষ্ণু নিজে দক্ষকে বললেন শিবহীন যজ্ঞ হলে মহা অনর্থ হবে। যজ্ঞের প্রধান ভাগ রয়েছে শংকরের। তিনি গ্রহণ না করলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণুও গ্রহণ করতে পারেন না। দক্ষ শোনেন না কাহারও কথা। তার প্রতিজ্ঞা, শিবহীন যজ্ঞ হবে। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে, জ্ঞান হারা হয়ে করতে চলেছে শিবহীন যজ্ঞ।

এখান থেকে সামান্য একটু দূরে, ঐ যে গৌরী কুণ্ড। ঐ কুণ্ডেই জ্বলে উঠেছে যজ্ঞাগ্নি যজ্ঞ ধূমে আকাশ বাতাস গেছে ছেয়ে। মুনি ঋষিগণ দেবতাগণ, ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায় চিন্তাকুল। যজ্ঞের ধূমে তারই ইঙ্গিত ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে।

ওদিকে কৈলাশে চলেছে তখন আর এক ঘটনা। পিতার যজ্ঞের খবর পৌঁছে গেছে সতীর কানে। জগৎ জননী মাতা সতী বহুদিন থেকেই ভাবছেন স্বামী নিন্দুক অহংকারী পিতার গড়া দেহ তিনি পরিত্যাগ করবেন। নূতন দেহ ধারণ করে, স্বর্চ শুভ্রা হয়ে ভোলানাথের আরাধনা করবেন। যোগাসনে ভোলানাথের হৃদয়ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায়। কিন্তু তিনিও যে অসহায় নিজের সৃষ্ট বিধানের কাছে। এ যে, 'আপনি প্রভু বাঁধা আপন ডোরে।'

আসন্ন মাতৃ বিরহে কাঁদছে কৈলাশ। কাঁদছে নন্দী ভৃঙ্গী। মাও কাঁদছেন না, তা নয়। জল ভরা আঁখি পল্লব দুখানি স্বামী পদে ন্যস্ত করে হাতজোড় করে মিনতি করছেন মাতা। সকরুণ মুখে অর্ধনিমীলিত চক্ষে শংকর শংকরীর দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথমে মিনতি. পরে ক্রোধ। শংকরীর ক্রোধে জন্ম নেয় দশমহাবিদ্যা। শংকর ভীত। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, দর্শন করেন দশদিকে ভয়ংকরা দশরূপাকে। কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়ষী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরব, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, কমলা, বগলা।

—না, আর নয়। যাও তুমি সতী পিতৃ গৃহে।

ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে। আদেশ দেন শংকর—নন্দীকে ভৃঙ্গীকে, মাতাকে অনুসরণ করতে,

এতক্ষণ অঞ্জলি বিশ্বনাথ একাগ্র মন নিয়ে আমার কথাগুলি শুনছিল। এবার অঞ্জলি প্রশ্ন করল,

—দাদা, দক্ষ তো মহাদেবের শ্বশুর। তবে কেন তিনি জামাইয়ের উপর এত বিরূপ ছিলেন?

আমি বললাম।

—তার কারণ অন্যত্র। একবার প্রয়াগে একটা মস্তবড় যজ্ঞ হয়েছিল। তাতে সমস্ত মুনি ঋষি এবং দেব দেবীগণ হাজির হন। এবং সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে মহারাজ দক্ষকে সম্মান প্রদর্শন করেন। কেবল উঠে দাঁড়ান নি মহাদেব। এতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হন। সর্বশেষে মহাদেবকে ভর্ৎসনা করেন। সেই থেকে দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরে।

বিশ্বনাথ বলল,

—তার পরে কি হল বলুন?

আমি আবার ফিরে এলাম পূর্ব কথায়।

—মাতা এলেন পিতৃগৃহে। সতীকে পেয়ে সতীর মাতা হলেন খুশী। সতী মায়ের নিষেধ সত্বেও চলে এলেন অন্তঃপুর ছেড়ে, যজ্ঞ সভায়। দক্ষ সতীকে দেখতে পেয়েই ক্রোধে আত্মহারা হয়ে শিব নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। সতী চেষ্টা করলেন তাকে নিবৃত্ত করতে। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে, অপমানে ক্ষোভে নিজের উপর ধিক্কার হানতে লাগলেন। অবশেষে বললেন

হে পিতঃ আপনি অজ্ঞানতা বশতঃ যার নিন্দা করছেন, তিনি সকল দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য এবং প্রাণী কূলের প্রণম্য, তিনি ভোলানাথ। আপনার নিন্দা স্তুতি কোন কিছুই তাকে বিব্রত করবেনা। তিনি সকল নিন্দা স্তুতির ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন। সকলের তিনি পূজ্য। আপনি আমার জন্মদাতা পিতা। শিব নিন্দা করে আপনার ঐ দেহ অপবিত্র, অশুচি হয়েছে। ঐ অপবিত্র দেহ থেকে আমার জন্ম। অতএব এই দেহও আমার অপবিত্র। অপবিত্র দেহে দেবাদিদেবের তপস্যা করা অপেক্ষা এই যজ্ঞাগ্নিতে আমার দেহ বিসর্জন দেওয়া আমি শ্রেয় মনে করি।

এই কথা বলে সতী যোগধ্যানে নিজেকে আহুতি দিলেন।

চারিদিকে হাহাকার উঠল। অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল বইতে লাগল। ভয়ে মুনি ঋষিগণ দক্ষকে তিরস্কার করে যে যেদিকে পারলেন উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে শুরু করলেন। দেবতাগণ মাতার বিরহে ভগ্ন হৃদয়ে, ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্থান ত্যাগ করলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু আগেই চলে গিয়েছিলেন। যজ্ঞস্থলে রইল কেবল দক্ষের কিছু অনুগত এবং প্রধান পুরোহিত ভৃগু। মাতৃহারা হয়ে নন্দী ভৃঙ্গীদ্বয় হাহাকার করে ধেয়ে এল যজ্ঞ সভায়, মহারাজ দক্ষের সৈনিকরা তাদের দুজনকে হটিয়ে দিল। তারা হাহাকারে ছুটলেন কৈলাশের দিকে।

এদিকে যোগাসনে বসে ভোলানাথের ভুল হয়ে যাচ্ছিল বারে বার। মঙ্গলের দেবতা অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছেন। এই সময় আর্তনাদ উঠল 'মা নেই' 'মা নেই' বলে। ছুটে এল মাতৃহারা নন্দী ভৃঙ্গী। কৈলাশের পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ল আর্তনাদ। ধ্যান ভেঙ্গে গেল ধবংসের দেবতা রুদ্রের। রুদ্র এবার উঠলেন জ্বলে।

তৃতীয় নয়ন থেকে বেড়িয়ে এল দাবানল। ঈশানের বিষাণ উঠল বেজে গুরু গুরু শব্দে। সুপ্ত আগ্নেয় গিরি শুরু করল অগ্নি উদ্‌গিরন্। অসীম ক্রোধে মাথার জটা ছিড়ে আছড়ে মারলেন রুদ্র পাশানের পরে। জন্ম নিল এক মহা শক্তি মান পুরুষ, বীরভদ্র। রুদ্র তাকে দিলেন নিজের ত্রিশূল। আদেশ দিলেন তাকে, যজ্ঞ পণ্য করে দক্ষ নিধনে।

এই বলেই আমি থেমে গেলাম। অঞ্জলি বলল,

—তার পর ? তার পর কি হল ?

আমি বললাম,

যজ্ঞাগার হল লণ্ড ভণ্ড। দক্ষ হল নিহত, ভৃগুর দাড়ি হল উৎপাটিত। খবর পেয়ে সতীর মা অন্দর মহল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেড়িয়ে এসে স্তব করতে লাগলেন রুদ্রকে। তিনি যে আজ স্বামী হারা, কন্যা হারা। রুদ্র হলেন ভোলানাথ। ভুলে গেলেন তিনি দক্ষের সমস্ত অপরাধ। ভুলে গেলেন তিনি সব। দক্ষকে জীবন দান করলেন তিনি। তবে যে মুখে শিব নিন্দা করেছেন মহারাজ দক্ষ—সেই মুখ আর ফিরে পেলেন না তিনি, পেলেন ছাগমুণ্ড। সেই ছাগ মুণ্ড নিয়েই স্তুতি করতে লাগলেন ভোলানাথের। ভোলানাথ সতীকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঐ হর-কী-পেইড়ী ঘাট থেকে চলে গেলেন উপরে। মহাদেবের আলয় কৈলাশে।

বিশ্বনাথ এবং অঞ্জলি নিস্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল। আমিও নিরব হয়ে রইলাম।

আমরা যেখানে বসেছি তারই সামনে দিয়ে কুল কুল করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। শুনেছি, মূল গঙ্গাই নাকি আগে এখান থেকে বয়ে যেত ভীম্ম ভৈরব রবে। গঙ্গায় বাঁধ দেবার ফলে, এধারের গঙ্গা মজে গিয়ে হয়ে গেছে ক্ষীণ স্রোতা। আমাদের দেশে যাকে বলি খাল। এখানকার গঙ্গা বর্তমানে অনেকটা তাই। ধীরে বয়ে চলেছে দক্ষিণ মুখি, তবে এককালে যে অনেক বড় ছিল তার চিহ্ন এখনও রয়েছে বর্তমান। দক্ষের এখন যে সুন্দর মন্দিরটি গড়ে উঠেছে, তা খুব বেশী দিনের নয়। মন্দিরের পরে একটি প্রশস্ত মাঠ। মাঠের উত্তর দিকে দক্ষের আদি প্রাসাদ। ছাত ধ্বসে গেছে। দেয়ালের চুন সুরকি ইত্যাদি খসে পড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মহলে মহলে গজিয়ে উঠেছে বন জঙ্গল। সাপ খোপ থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। তবে এটাই যে দক্ষের মূল আবাসস্থল ছিল একথা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের উত্তর বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিত হবে। আমি আগেই বলেছি বিশ্বাস করে ভাবতে ভাল লাগে।

আমি অঞ্জলিকে হেসে বললাম,

—অঞ্জলি ঐ যে সতীর ঘাট দেখছ, ওখানে বসে স্বামীকে পুজো দিতে হয়। পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে জলদান করতে হয়।

আমার কথা শুনে বিশ্বনাথ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

অঞ্জলি কিন্তু কথাটা পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করেছে। সে বিশ্বনাথের একটা হাতে ঝাকুনি দিয়ে বলল,—ওঠো, পূজো দিতে হবে।

বিশ্বনাথ আমার দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে রইল। আমিও তাকে উঠতে ইশারা করলাম, বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়াল। আমি অঞ্জলিকে বললাম,

—বিল্টুকে আমার কাছে দাও। নতুবা তোমাদের পুজো দিতে অসুবিধা হবে।

ইতমধ্যে বিলটুর সাথে আমার ভাব হয়ে গেছে, বিলটুর চোখ দুটি কিন্তু ঠিক অঞ্জলির মত হয়েছে, রংটা পেয়েছে বিশ্বনাথের অর্থাৎ ফর্সা। মাথায় একবোঝা কোকড়ান চুল। সব সময়ই অশান্ত, অঞ্জলি বিশ্বনাথকে নিয়ে চলে গেল পূজো দিতে। আমি বিলটুকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখতে লাগলাম।

এ মন্দিরটি নতন। এটি যে নতন তা সহজেই বুঝা যায় এর গঠনশৈলীর দিকে তাকালে। এদিকের সব মন্দিরেই শিবলিঙ্গ অপরিহার্য। মন্দিরের চারিদিকে বিভিন্ন ফটো দেয়া আছে। ফটোগুলিতে দক্ষ সভার বিভিন্ন স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে। সর্বত্রই দানের বাক্স দেওয়া আছে কিন্তু পাণ্ডাদের টানা হেঁচড়া নেই কোথায়। এটাই ভাল, দেবস্থানে গেলে যদি টানা-হেঁচড়া শুরু হয়ে যায় তবে মনে বিরূপতা আসতে বাধ্য। লক্ষ্য করেছি হরিদ্বারের বহু মন্দিরেই পাণ্ডাদের অত্যাচার অনুপস্থিত। এর ফলে দানের বাক্সে বা থালায় দর্শনি কিছু কম পড়ে না। আগেই বলেছি পুজোর আড়ম্বর উপকরণ, দরকষাকষি এখানে বড হয়ে উঠতে পারেনি বলেই ভক্তি খবরদারী করে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।

মহারাজ দক্ষের বাড়ীর তিন দিক উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমদিকে প্রবেশ-দ্বার বা ফটোক্। পূর্ব উন্মুক্ত, পূবে গঙ্গা, দক্ষিণে একটু গেলেই মাতা আনন্দ-ময়ীর আশ্রম।

অঞ্জলি বিশ্বনাথকে নিয়ে ফিরে এল। কপালে ওর একটা বড় সিঁদুরের ফোটা, বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। মুখে তৃপ্তির হাসি, সতীর ঘাটে অঞ্জলি বিশ্বনাথের পা ধুইয়ে দিয়েছে, দুহাত দিয়ে গঙ্গার জল তুলে। মা গঙ্গার পুজো দিয়েছে। দুজনে মিলে দিয়েছে পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে জল।

"ওঁ আব্রহ্ম ভুবনা লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতা মহোদয়ঃ॥
অতীত কুল কোটিনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাম।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম॥"

অঞ্জলি আবার নূতন করে বিশ্বনাথের হাত ধরে পরম তৃপ্তিতে বলেছে যদস্তুৎ হৃদয়ং তবঃ, তদস্তুৎ হৃদয়ংমমঃ।

আমি ওদের দিকে তাকাতেই ওরা দুজনে লজ্জা পেয়ে হেসে দিল। হঠাৎ গলায়

আঁচল দিয়ে গড় হয়ে আমায় প্রণাম করল। বিশ্বনাথ ও অঞ্জলিকে অনুসরণ করল। আমি বাধা দিয়ে বললাম,

—মন্দিরে দেবতাকে প্রণাম করতে হয়। তোমরা দুজনে সুখী হও।

দশ বৎসর আগে অঞ্জলির উপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রচণ্ড ঝড়। বিশ্বনাথও তা থেকে বাদ যায় নি। বরং বিশ্বনাথকে সব চাইতে বেশী প্রসংশা করতে হয়। ধৈর্য্য ওর অসীম। লজ্জা নম্র ঐ দেহটার মধ্যে রয়েছে একটা বজ্র কঠিন আত্মপ্রত্যয় এবং সংকল্প। নতুবা যে দিন বিশ্বনাথের বাবা ওদের বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন সে দিন থেকেই বিশ্বনাথ দূরে সরে যেত। কিন্তু ও তা করেনি। বরং সব জেনে শুনে মা বাবা মরে যাবার পরেও ধৈর্য্য ধরে অঞ্জলির জন্যে অপেক্ষা করেছে। বেনারসে থাকলে অঞ্জলির স্মৃতি ওকে পীড়া দেবে বেশী। তাই বেনারসের পাট তুলে দিয়ে চলে এসেছে দেরাদুনে চাকুরী নিয়ে। অঞ্জলি রাগ করে চলে যাবার পরেও গোপনে বিশ্বনাথ অঞ্জলির খোঁজ করেছে। অঞ্জলি জিদের বশবর্তী হয়ে পৃথ্বীপালের সাথে চলে গেলে ওর ভুল ভাংতে দেরী হয় নি। দিল্লী থেকে ফিরে এসে লজ্জায় ভয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা করার ভরসা পায় নি। তার পরের দিনই পালিয়ে গিয়েছিল দিল্লীতে। বিশ্বনাথ কিন্তু বিশ্বাস করত অঞ্জলিকে তার কাছে আসতেই হবে। দুটো বৎসর উভয়ে উভয় থেকে ছাড়া হয়ে ভালই হয়েছিল। পরস্পরকে চিনতে পেরেছে এই সময়ের ব্যবধানে। ওরা দুজনেই বুঝে ছিল একে অপরকে পেতেই হবে। ছেলেবেলার সাথী হবে জীবনের সাথী।

অঞ্জলি আমাকে একান্তে পেয়ে বলেছিল,

—দাদা, ফিরে পেলাম আমি সব। কিন্তু মাঝখান থেকে একটা ক্ষত থেকে গেল। পৃথ্বীপাল আমার গায়ে কাদা লেপটে দিয়েছে। এ যে আমি ভুলতে পারছিনা। যখনি আমি আমাকে উজাড় করে তুলে ধরতে চাই আমার স্বামীর কাছে, তখনি আমার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে। ও কিন্তু দাদা ওসব কথা নিয়ে চিন্তা করতে দেয় না এতটুকু। ও আমাকে ক্ষমা করেছে পরিপূর্ণ ভাবে।

আমি অঞ্জলিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,

বিশ্বনাথ তোমার সত্যিই বিশ্বনাথ। ওর মত ছেলে হাজারে একটি মেলেনা। সত্যি বলতে কি এমন সুন্দর ছেলে খুব বেশী আমার নজরে পরেনি। ভুলে যাও অঞ্জলি, ভুলে যাও। দুর্যোগের ঐ কটা দিনকে তুমি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা কর। দেখ আকাশের চাঁদ অত সুন্দর কেন জান? ওর গায়ে ঐ কলঙ্কের আঁচড় আছে বলেই। তুমি আমি তো মানুষ, দেবতা তো নই। সব কিছুই আমাদের থাকবে। সুখ, দুঃখ, কলঙ্ক, বিপর্যয়, এগুলো বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। যেটা তোমার

জীবনে ঘটেছে, সেটা তোমার ইচ্ছায় নয়। মনে করে নাও ওটা একটা স্বপ্ন। তুমি পাপ করতে চাওনি। জোর করে তোমায় পাপী বানান হয়েছে। ইচ্ছাকৃত-ভাবে যে অন্যায় না করে, সেটা অন্যায় নয়। পাপ পুণ্য ন্যায় অন্যায়ের সংজ্ঞা মিলান বড় দায়।

অঞ্জলি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আমি আবার বলতে থাকি, —তোমার আমার মনই হচ্ছে মন্দির। মন্দিরে সকলেই আসে দর্শন করতে। আসে সাধু সজ্জন। আবার পাপী আসে পুণ্যার্জনের আশায়। মন শুচী করে তারা ফিরে যায়। দেবতাকে নমস্কার করে সাধুসজ্জন বলে, 'হে দেবতা তুমি আমার জ্ঞানের আলোকে আলোকিত কর।' যে পাপী পাপ স্খলনের জন্য আসে সে বলে দয়াময়! তোমার দয়ায় আমার পাপ ধৌত কর।' আর যে দুষ্কৃতকারী সে বলে 'আমি যে অন্যায় করি তা যেন ধরা না পড়ি।' মন্দিরে সকলেই আসবে। আমাদের কাজ হচ্ছে প্রথম দুজনকে ধরে রাখা। মন্দির যেমন সারাদিনের যাত্রী আগমনে ভরে যায়। ভোরে এবং রাত্রে পূজারী ধুয়ে পুছে আবর্জনা সাফ করে দেয়। তেমনি অবিরত ধুয়ে পুছে মনকে পবিত্র রাখতে হবে।

অঞ্জলি কি বুঝল জানিনা। কিন্তু ওর চোখ দুটি জল জল করে জ্বলে উঠল, দেখতে পেলাম। ও বলল,

—আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন দাদা। আমি যেন তাই পারি।

—আমি নয় অঞ্জলি। তুমি তোমার মনের কাছেই সে প্রার্থনা জানাও। তুমি নিজেই তো দেবী। মানুষের মধ্যেই দেব দেবার মন্দির। মানুষই দেবতা গড়ে দেবতার কানুন গড়ে। আবার সেই মানুষই অস্বীকার করে। মানুষের শুভ ইচ্ছাই দেবতা। আর অশুভ ইচ্ছাই দৈত্যদানব। এই শুভাশুভের যুদ্ধই দেবাসুরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ, এ দ্বন্দ্ব সর্বদাই চলছে মনের মধ্যে। এ যুদ্ধ চলছে গোটা পৃথিবী জুড়ে অহরহ। মানুষই সব। মানুষই দেবতা, আবার মানুষই দানব।

মহারাজ দক্ষ সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়ে, সর্ববিদ্যায় দক্ষ হয়েও, মঙ্গলকে আবাহন করতে পারেননি বলেই তার অরিজিনালিটি হারিয়ে ছাগমুণ্ড লাভ করেছিলেন। তৎকালের অশুভ চিন্তার নায়ক ছাগমুণ্ডধারী দক্ষ ছিলেন একজন। অজকাল কত ছাগমুণ্ডধারী সমাজের কর্ণধাররূপে ঘুরে বেড়ায় তার ইয়ত্তা নেই। সেকালে দণ্ড দিতে নেমে এসেছিলেন মঙ্গলের প্রতীক. কল্যাণের প্রতীক শিব। আজকের দক্ষদের সাজা দেবে কে?

কনখলের আর একটি জায়গা প্রতিনিয়ত আমাকে আকর্ষণ করে। সে হচ্ছে মাতা আনন্দময়ীর আশ্রম। সতী ঘাট থেকে সামান্য একটু দূরে গঙ্গার পাড়ে মায়ের

আশ্রম। মায়ের সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা, গল্প অনেক মানুষের মুখে শুনেছি। কিন্তু মান্যবর, সুসাহিত্যিক আমার 'দ্রোণাচার্য্য গুরু' অবধূতের, মায়ের সম্পর্কে লেখা বই পড়ে, আমার মন হয়ে উঠে অশান্ত। মনে ইচ্ছা জাগে হরিদ্বারে গিয়ে মানবী রূপা দেবী দুর্গাকে দর্শন করব। কিন্তু গিয়ে শুনলাম মাত্র কয়েদিন আগে দেরাদুন চলে গেছেন। ফিরে এলাম ভগ্ন মনোরথ হয়ে। এতদিনের মনের বাসনা, পূর্ণ হলনা, দেখে মনে অভিমান হল। মনে স্থির করলাম ছেলে ডেকেছে মাকে। তাকে একদিন আসতেই হবে সন্তানকে দেখা দিতে। তবে সেটা কবে ?

বীরভদ্রের মন্দির এবং আরো কয়েকটি মন্দিব দর্শন করে আমরা যখন বেরোলাম তখন রাত নটা বাজে। আমি ওদের বললাম কোন দোকানে বসে একটু চা খেয়ে ফেরা যাক।

ঘরে ফিরে আসতেই অঞ্জলি আব্দার শুরু করলে,

—দাদা, কাল যাব সপ্তর্ষি, ভীমগোডা, পরশু হৃষিকেশ, লছমন ঝুলা।

প্রমাদ গুণলাম মনে মনে, করুণ কণ্ঠে আমি শেষ রক্ষা করতে চাইলাম।

—অঞ্জলি কাল আমায় ছেড়ে দাও। তোমরা তো ও গুলো দেখেছ। তোমাদের যদি একান্তই যেতে ইচ্ছে করে তোমরা দুজনে যেও।

অঞ্জলি প্রবল আপত্তি তুলে বললে,

—সে হবে না। আপনার থাকতেই হবে। আপনার মুখ থেকে শুনব নূতন করে। আপনি কেমন সুন্দর করে গুছিয়ে বলেন। অনেকবার শোনা কথাও আপনি বললে নূতন মনে হয়।

মনে মনে বুঝলাম এটা অঞ্জলির একটা ছল মাত্র। আসলে ও আমাকে কিছুদিন ধরে রাখতে চায়। বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে বললে,

—সেকথা কিন্তু ঠিক দাদা। আপনার থাকতেই হবে।

বিশ্বনাথ কথা বলে কম। কিন্তু যখন বলে তখন যে সেটা মনের গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে, তা বুঝতে পারা যায়। বুঝতে পারলাম, অঞ্জলিকে যদি বা এড়াতে পারি, বিশ্বনাথকে পারব না।

যদিও মুখে আর আপত্তি প্রকাশ করলাম না। কিন্তু মনে মনে বুঝলাম ঝামেলায় পড়ে গেছি। মনের গহনে আমার যে থাকবার ছোট্ট ইচ্ছা নেই, এমন কথা বলব না। এত স্নেহ, এত আদর, এত ভালবাসার কি কোন আকর্ষণ নেই ? কিন্তু আমি যে পথের আকর্ষণে বেরিয়েছি। পথ চলা আমার নেশা, পথের হাতছানিতে কি সাড়া না দিয়ে পারি ! ও যে আমার সাথী। পথ যে দিয়েছে আমায় অনেক কিছু, আমার বুভুক্ষু মনকে কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছে।

রাতের আহারটা বেশ ভালই হল। দেরাদুন চালের গরম গরম ভাত, ঘি, আলুসেদ্ধ, আলুভাজা, পাঁপড ভাজা, বাঁধাকপির তরকারী, ডাল। পরিশেষে রাবড়ি। হরিদ্বারে যে তিনজনের আগমন নিষেধ। খেতে বসে তাদের অনুপস্থিতি মনে পড়ে। যদিও আমি সর্বভুক। খাবার ব্যাপারে আমার কোন অবস্থাতেই অসুবিধা হয় না। রান্নার কাজটা অঞ্জলি নিজেই দেখাশুনা করে। কুন্তিকে এ ব্যাপারে খুব একটা ঘেষতে দেয় না। কুন্তি প্রথম প্রথম আপত্তি তুলেছিল,

—দিদিমণি তুই যদি আমায় কুছু করতে না দিবি, তবে আমায় আনলি কেনে?

অঞ্জলি হেসে বলত,

—ভাল বর পেলে তোকে বিয়ে দিয়ে দেব।

প্রথম প্রথম কুন্তি লজ্জা পেত। এখন আর পায় না। কিছু বলেও না। খেতে বসে অঞ্জলিকে প্রশ্ন করলাম,

—কাল সকালের কি প্রোগ্রাম?

—খুব ভোরে উঠে চণ্ডী পাহাড। ফিরে এসে গঙ্গায় স্নান।

—বিলটুকে নিয়ে যাবে?

—না, ওকে রেখে যাব। আমরা তো নটার মধ্যেই ফিবে আসবো।

—হ্যাঁ, খুব ভোরে বেরুতে পারলে নটার মধ্যে ফিরে আসতে পারব। অতএব আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়।

॥ নয় ॥

হরিদ্বারে গঙ্গার পাড়ে দাঁড়ালে সোজা পূর্বদিকে যে পাহাড়টা, ওটাই হচ্ছে চণ্ডী পাহাড়। চণ্ডী পাহাড়কে নীল পর্বতও বলে। আর হরিদ্বারের গা বেয়ে পশ্চিমদিকে যে পাহাড় ওটা হচ্ছে মনসা পাহাড়। দুই পাহাড়ের শীর্ষে বসে আছেন দুই দেবী, চণ্ডী এবং মনসা। দুই দেবী যেন দুই শীর্ষে দাঁড়িয়ে হরিদ্বারকে রক্ষা করছেন। মনসা পাহাড়ের ন্যায় চণ্ডী পাহাড়ে এখনও রোপওয়ে হয়নি। উঠবার রাস্তাও বাঁধান নয়। অর্থাৎ চণ্ডী পাহাড় মনসা পাহাড় অপেক্ষা দুর্গম। দূরত্বের দিক থেকেও বেশী।

পরের দিন ভোর পাঁচটায় উঠে প্রস্তুত হয়ে তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। হরিদ্বারের ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়া বেশ আরামদায়ক। একটু একটু শীত করছে। রাস্তায় মানুষের যাতায়াত এখনও ভাল করে শুরু হয়নি। কুকুরগুলি কুকড়ি মেরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। রাস্তায় আলো জ্বলছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা কেহ বা স্নান করছেন, কেহ বা স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছেন। মন্দিরগুলিতে ঘণ্টা বাজছে একটানা। ঘুমন্ত হরিদ্বার 'এই জাগি, এই জাগি', করছে।

হরিদ্বারের গঙ্গা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। দুটি স্রোতের উপরেই মোটা মোটা কংক্রিটের থামের উপর ব্রীজ হয়েছে। হরিদ্বারে গঙ্গার উপরে আরো কয়েকটি ব্রীজ আছে। চণ্ডীপাহাড় যেতে প্রথম ব্রীজ পেরিয়েই সোজা উত্তরে দেরাদুন মুশৌরী যাবার বাস রাস্তা চলে গেছে। দ্বিতীয় ব্রীজ পেরিয়ে চণ্ডীপাহাড়ে যেতে হয়।

পাহাড়ের গা কেটে পায়ে চলার মত রাস্তা বানান হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে কাঁটা গাছ, বেল, শাল, দেওধার গাছের আধিক্য বেশী নজরে পড়ে। রাস্তার উপরে ছোট বড় গোল গোল সাদা পাথর ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্ততঃ। বেখাপ্পা পা পড়লে পা মুচকে যাবার সম্ভাবনা বেশী। অঞ্জলি আনন্দের আতিশয্যে প্রথমে ছুটে ছুটে উঠতে শুরু করেছিল। আমি হাসলাম। পাহাড়ে ওঠার ওর অভিজ্ঞতা কম দেখে। আমি বললাম,

—এভাবে ছুটলে তুমি হাঁপিয়ে পড়বে। আস্তে আস্তে উঠ।

চণ্ডীপাহাড়ে উঠবার একটাই রাস্তা। এখানেও অনেকে সোজা রাস্তায় উঠবার চেষ্টা করে। এতে একটু ঝুঁকি থেকে যায়। এক ভদ্রলোক তার কাঁধে একটি বাচ্চা নিয়ে এমনিভাবেই উঠছিলেন। আমরা তখন নেমে আসছিলাম। ভদ্রলোককে ছুটে গিয়ে যথাসময়ে না ধরলে হয়ত কি হত বলা যায় না। রাস্তা ধরে একটুখানি চড়াই ভাঙলেই

ভিখারীদের নজরে পড়ল। নানা স্বরে তারা ভিক্ষা চাইছে। যাত্রীরা উঠছে 'জয় মা চণ্ডী, জয় মা চণ্ডী' বলে। প্রায় অর্ধেকের বেশী পথ ওঠার পরে অঞ্জলি হাঁফিয়ে পড়ল। দরদর করে ঘামছে। রাস্তার উপরেই বসে পড়ল ও।

—আর পারছি না দাদা।

—বেশ এখানে বসে একটু বিশ্রাম করে নাও।

—একটু জল দিন তো, দাদা।

ওয়াটার বটলটা এগিয়ে দিলাম। বললাম,

—উঠতে পারবে? না ফিরে যাবে?

—না, না, এসেছি যখন, তখন উঠবোই।

চণ্ডীপাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে সোজা উত্তরে তাকালে কেদার বদ্রী পাহাড় নজরে পড়ে। আকাশপথে গেলে মনে হয় বেশী দূর নয়। চণ্ডীপাহাড় থেকে হরিদ্বারের দৃশ্যও মনমুগ্ধকর। যেন কোন দক্ষ কারিগরের গড়া একখানা সুন্দর ছবি। চণ্ডীপাহাড়ের প্রধান দর্শনীয় এবং আকর্ষণ চণ্ডীমাতার মন্দির। কালো পাথরের উপর খোদিত মাতা চণ্ডীর মূর্তি। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের মুখে একজন স্থলাঙ্গিনী মহিলা দ্বার জুড়ে চোখ বুঝে বসে আছে। যাত্রীদের ভিতরে ঢুকতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে আমি তাকে সরে যেতে অনুরোধ জানালাম। কথাটা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল কিনা বুঝতে পারলাম না। কিছুটা বিরক্ত হয়ে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে মাকে প্রণাম করলাম। মনে মনে প্রণাম করলাম চণ্ডীকে।

পাহাড় চড়াইয়ে যতটা কষ্ট, নেমে আসা ততটা কষ্ট না হলেও বিপদজনক। পা ফস্কালে অথবা ছুটে নামতে গেলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ। চণ্ডীপাহাড়ে পানীয় জলের সরবরাহব্যবস্থা সমস্যা মনসাপাহাড়ের মত নয়। যাত্রীসংখ্যাও কম। চণ্ডীপাহাড়ে পানীয় জল যায় অশ্বের পিঠে চেপে ভারে করে। পাহাড়ের উপরে এক গ্লাস জলের দাম দশ পয়সা। লক্ষ্য করলাম জলের পাইপ কিছুদূর অবধি গেছে। পাহাড়ের নীচেই নূতন রাস্তা বানান হচ্ছে পাহাড় কেটে। নামার সময় কানে এল পাশের পাহাড় থেকে ময়ূরের ডাক শোনা যায়। পাশের পাহাড়গুলোতে প্রচুর ঝোপ-ঝাড় এবং গাছ রয়েছে।

আমরা যখন নীচে নেমে এলাম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আটটা পঁচিশ। পাহাড়ের কোলে, হরিদ্বারের দিকে এগিয়ে আসতে, ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর। ঘর না বলে খড়ের ছাউনি দেওয়া খুপরী বলা চলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকেন ওগুলিতে। অর্থাৎ সন্ন্যাসী কলোনী। হবেই তো। এটা যে হরিদ্বার। যুগ যুগ ধরে এখানে আসছেন সাধক সন্ন্যাসীরা। এককালে ছিল এদের রাজত্ব।

আজ আর তা নেই। গৃহীদের জনস্রোত এদের ধাক্কা দিলেও একেবার উৎখাত করতে পারেনি। হিমালয় ভারতীয় সাধকদের সাধন কানন।

একদিকে ইট পাথরের আধুনিক ডিজাইনে গড়া, বিজলী পাখা, বিজুলী আলোতে সুসজ্জিত সাধন ভজনের আশ্রম। অপর দিকে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত সুনিবিড় গাছের ছায়ায়, পাহাড়ের কোলে শান্ত স্নিগ্ধ পাতার কুটিরের আশ্রম। এ দুটো দৃশ্যই চোখে পড়বে হরিদ্বারে। একটা শহরে বা শহর সংলগ্ন। অপরটা শহর থেকে দূরে। একটায় বিজুলীর আলো। প্রদীপের আলো। অপরটায় কিন্তু প্রকৃত আলো কোথায় জ্বলছে কে জানে ?।

হর শুনেছি বুড়ো। হরের বন্ধু হরি, সুতরাং তিনিও বুড়ো হয়েছেন। হরি বা হরের বয়স কত হয়েছে জানি না। তবে বৃদ্ধ হয়ে থাকলে আলো সেখানে প্রখর, সেখানে ঢুকতেই সুবিধে হবে। বিজুলীর আলো, প্রদীপের আলো আর জ্ঞানের আলোর মধ্যে যে তফাৎ রয়েছে অনেক। বিজুলীর আলোর লোডসেডিং হতে পারে। প্রদীপের আলো দমকা হাওয়ায় নিভে যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের আলো অনির্বাণ। সে আলো যেখানে, হরিহর সেখানে। সে আলো কোথায় ? অহংএ, না সাধনে ? কর্মে, না প্রচারে ?

খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে আমরা যখন সপ্তর্ষি যাবার উদ্দেশ্যে টাঙ্গায় চাপলাম, তখন বেলা বাজে ৩টা। টাঙ্গা চলেছে হর-কী-পেইড়ী ডাইনে রেখে সোজা উত্তরে। হরিদ্বারের সীমানাটাকে এই ভাবে বলা যায় পূর্বে চণ্ডী পাহাড় পশ্চিমে মনসা পাহাড়। উত্তরে সপ্তর্ষি দক্ষিণে কনখল। আমরা আজ চলেছি উত্তরে। অর্থাৎ যেখানে গঙ্গা অবতরণ করে সাতটি ধারায় ভাগ হয়ে গেছে।

ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছি গঙ্গা নদীর তিনটি গতি। উৎস থেকে অর্থাৎ মানস সরোবর থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত প্রাথমিক গতি। হরিদ্বার থেকে রাজমহল পর্যন্ত মধ্যগতি। রাজমহল থেকে বঙ্গোপসাগর শেষ গতি। সপ্তর্ষি থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে গঙ্গার প্রাথমিক গতি ছেড়ে মধ্যগতি লাভের অবস্থাটা উপলব্ধি করা যায়।

টাঙ্গায় বসে অঞ্জলিকে প্রশ্ন করলাম,

—আগে ভীমগোড়া দেখবে, না ফেরার পথে দেখবে ?

অঞ্জলি এবং বিশ্বনাথ বসেছে টাঙ্গায় পেছনে। আমি বসেছি সামনে সুতরাং আমি টাঙ্গাওয়ালাকে সেই ভাবে নির্দেশ দেব। অঞ্জলির পরিবর্তে বিশ্বনাথ জবাব দিল—আমাদের সপ্তর্ষি থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেলে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এখন যাবার পথেই চলুন।

আমি টাঙ্গাওয়ালাকে তাই বলে দিলাম। টাঙ্গা এগিয়ে চলল ভীমগোড়ার দিকে।

মহাভারত অনুসারে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবগণ সারমেয় সহকারে এই পথেই গিয়ে ছিলেন স্বর্গারোহনে। এই পথে এগিয়ে গেলেই স্বর্গারোহিণী নামে এক পর্বত আছে। নামটা পাণ্ডবদের স্বর্গারোহন কে কেন্দ্র করেই হয়েছিল কিনা সঠিক জানিনা। তবে আগেই বলেছি, বিশ্বাস করতে পারলে ভাবতে ভাল লাগে।

এটা যদি ধরে নেয়া যায় যে, পঞ্চপাণ্ডবগণ যারা জ্ঞাতি বধ, .এবং প্রধান সখা কৃষ্ণের দেহরক্ষার পরে যদি তাদের মন বিক্ষুব্দ হয়ে থাকে এবং বৈরাগ্যের উদয় হয়ে থাকে। তবে সেটা তো স্বাভাবিক। তাছাড়া সে সময় চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা থাকার ফলে শেষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ একটা পালনীয় প্রথা ছিল। এ দুয়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ রাজ্যপাট পরিত্যাগ করে যাত্রা করে ছিলেন কল্পোলোকের উদ্দেশ্যে। এখন ধরে নেয়া যেতে পারে যেহেতু সমগ্র উত্তর ভারতের জীবন দায়িনী পতিত পাবনী গঙ্গা। গঙ্গার ধারা নেমে এসেছে ঐ সুন্দর মেঘলোক হিমালয়ের বুক চিরে, অতএব এই দিকেটাই পঞ্চপাণ্ডবদেরকে আকর্ষণ করত বেশী সুতরাং পঞ্চপাণ্ডবগণ এই হরিদ্বার হয়ে চলে গিয়ে ছিলেন উপরে অর্থাৎ হিমালয়ে। এ ভাবনা অমূলক নয়।

ভীমগোড়া মন্দির পাহাড়ের কোলে। মনসা পাহাড়ের গুহায় অবস্থিত। মনসা পাহাড়ের একদিকে বিল্বকেশ্বর অপরদিকে ভীমগোড়া, নীচে পাথরে বাঁধান অনেকটা। আমাদের দেশে যাকে বলে ডোবা। ডোবাকৃতি জলাধার। জলাধারটি গোল। চারিদিকে বাঁধন সিঁড়ি বা সোপান। জলাধারে জলখুব বেশী নেই। জলের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। গায় দিয়ে রেললাইন চলে গেছে ঋষিকেশে। শুনলাম খুব কাছেই ভীমগোড়া স্টেশন। কথিত আছে ভীমের গদার আঘাতে তৈরি হয়েছিল ঐ জলাশয়। একজন পাণ্ডা আমায় জানালেন এই জলাশয়ের জলের সাথে গঙ্গার যোগ রয়েছে। এটা নাকি অত্যন্ত প্রাচীন মন্দির। প্রাচীন তো হবেই। ভীমের গদার আঘাতে যদি ঐ জলাশয়। তৈরী হয়ে থাকে, তবে সেটা প্রাচীন হবে না? পাণ্ডারা বললেন এই জলে স্নান করে ঐ মন্দির দর্শন করলে অন্তে স্বর্গ লাভ হয়।

অন্তে স্বর্গলাভের কামনা আমি খুব একটা করিনা। ও লোভ আমার নেই। আমি চাই আমার এই মাটির ধরায় নেমে আসুক স্বর্গ। আমার মাটির মাকে ছেড়ে আমি যেতে চাইনা কোথাও। এই মাটির মায়ের টানেই যেন ফিরে আসি মহামানবের মাঝে বারবার। আলাদা স্বর্গের সুখ ভোগের কামনা আমার নেই। আমার কামনা এই মাটির মায়ের সন্তানদের মনে গড়ে উঠুক এক একটি স্বর্গ। এখানে থাকবে না শোষন, থাকবে না প্রবঞ্চনা, থাকবে না হিংসা, থাকবে না অহংকার। এখানে আর রচিত হবেনা নাগাসিকি হিরোসিমার কল্পনা ঘন দৃশ্য। এখানে এই মাটির বুকে রচনা করব আমরা স্বর্গ। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে গড়ে উঠবে ভালবাসা.

প্রেম। এই ধরার ধূলার স্বর্গে নেমে আসবে মানব রূপে ভগবান। এখানে স্নান করলে যদি আমার এই কামনা সিদ্ধ হয়, তবে এক বার কেন—যতক্ষন পর্য্যন্ত আমার নিমোনিয়া না হয় ততক্ষন পর্য্যন্ত ডুব দিতে রাজী আছি। মুখে সে কথা প্রকাশ করলাম না।

বিশ্বনাথ হেসে বলল,

—তা হলে তো দাদা, অন্ততঃ মরে গিয়ে স্বর্গলাভ করব। সে ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে রইল।

—কিন্তু স্বর্গ অবধি তো যাওয়া হবে না।

—কেন ?

—স্নান এবং দর্শন দুটোই করতে হবে। আমরা তো মাত্র দর্শন করেছি। স্নান তো করিনি।

আমাদের কথায় অঞ্জলি হাসল না। ও পাণ্ডার কথায় বিশ্বাস করেছে। বরং কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল,

—তা হলে তো আর একদিন এসে স্নান এবং দর্শন করে যেতে হবে।

আমি হাসলাম, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। বিশ্বনাথ বলল,

—তোমায় তাহলে স্বর্গে যেতেই হবে ?

অঞ্জলি ক্ষোভ প্রকাশ করে বললে,

—দেখ, এসব অত হালকা ভাবে নিও না। স্বর্গে না যাই নিজেকে পবিত্র বলে মনে করতে পারব তো ?

আমি ইশারায় বিশ্বনাথকে তর্ক করতে নিষেধ করলাম। মনে মনে ভাবলাম অঞ্জলির মনের কোণে যে কালির আঁচড়টুকু লেগেছে, তাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে চায় বিশ্বাসের জলে অবগাহন করে। করুক না তাই। এটা করে যদি ও নিজেকে পবিত্র বলে মনে করে করুক। মানুষের মনে যখন কোন সংস্কার দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়, তখন তা থেকে হঠাৎ জোর করে ফিরিয়ে আনতে গেলে, ফল অনেক সময় উল্টো দাঁড়ায়। ওটা করতে হয় আস্তে আস্তে। যতটুকু সয় তার বেশী নয়। রুগীকে একসাথে সব ওষুধটা খাইয়ে দিলে তো রুগীর অবস্থা কাহিল।

মনে পড়ে গেল সতীর ঘাটে পুজো দেবার পরে অঞ্জলির স্নিগ্ধ হাসিটুকু। দশটা বছর আঁচড়ের জ্বালায় ও জ্বলেছে। মনে মনে কষ্ট পেয়েছে খুব। ওটা বেড়ে দগ্‌দগে ঘা না হবার আগেই ক্ষতটা শুকিয়ে ফেলা দরকার। বিশ্বাস এনে দেয় মানুষকে মুক্তি। তাকে গড়ে তোলে শুচি, শুভ্র। তেমনি আবার অন্ধ গোঁড়ামি মানুষকে বিপথগামী করে।

এবারে আমাদের টাঙা চলেছে আরো উত্তরে, সপ্তর্ষি অভিমুখে। ভীমগোড়া থেকে সপ্তর্ষি প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা। এই রাস্তাই চলে গেছে ঋষিকেশ অভিমুখে। এই রাস্তায় সাধু-সন্ন্যাসীদের আধিক্য নজরে পড়ে। তীর্থযাত্রীদের ভীড় হরিদ্বার অপেক্ষা কম। পথে স্বামী শুকদেবানন্দজীর 'পরমার্থ আশ্রম' দর্শন করে নিলাম। হরিদ্বারের গায়ে গায়ে আশ্রম মন্দির। সব দেখতে গেলে এবং বর্ণনা দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়।

আমাদের টাঙা এসে দাঁড়াল সপ্তর্ষি আশ্রমের গেটে। আশ্রমে ঢোকার আগেই বিশ্বনাথ প্রস্তাব করল,—একটু চা খেয়ে নেয়া যাক দাদা।

—মন্দ নয়।

চায়ের তেষ্টা আমারও পেয়েছিল। গেটের মুখে কয়েকটা চা এবং খাবারের দোকান রয়েছে। তার একটায় ঢুকে তিন কাপ চা এবং গরম সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিলাম।

সিঙ্গাড়ার কথা বলতে গিয়েই একটা কথা মনে পড়ে গেল। 'অম্ল' নামক একটি ব্যাধিকে দীর্ঘ দিন ধরে আমার দেহে পোষণ করছিলাম সযত্নে। পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে ইনি অত্যন্ত সুপরিচিত। পশ্চিবাংলার জলে, হাওয়ায় বেশ ভালই থাকেন। ইনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। রবীঠাকুরের 'পুরাতন ভৃত্য'-এর ন্যায়। কত ভৎর্সনা করি, করি তিরস্কার। তবু ত্যাগ করেন না আমায়। সিঙ্গাড়া, তেলেভাজা, ভাজাভাজাত দ্রব্যে ওনার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। মায়ায় পড়ে গেছি। হরিদ্বারে এসে হঠাৎ ওনার আর খোঁজ পাচ্ছি না। এত খুঁজছি। তাই সিঙ্গাড়ার লোভে যদি আসেন। দেখা যাক।

সপ্তর্ষি আশ্রম এলাকাটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। গেট থেকে বাঁধান রাস্তায় কিছুটা সোজা এলোগেই মূল মন্দির। মন্দিরের চারদিকে সাতজন প্রাচীন ঋষির পাথরের মূর্তি রয়েছে। এঁদের স্মরণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সপ্তর্ষি আশ্রম, এবং জায়গাটির নাম সপ্তর্ষি। এই আশ্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মর্মর মূর্তি। ভারতে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রবল জোয়ারে সনাতন হিন্দুধর্ম ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল, সেই সময়ে শংকরাচার্য্যের আবির্ভাব রক্ষা করেছিল সনাতন হিন্দুধর্মকে।

আশ্রমের চারদিকে গাছের ছায়ায় গড়ে উঠেছে এক একজন ঋষির নামে এক একটি কুটির। ঘুরে ঘুরে দেখলাম কোন কুটিরের নাম গৌতম, কোনটার নাম অত্রী, কোনটা বশিষ্ঠ, কোনটা বিশ্বামিত্র ইত্যাদি। কুটির বলা বোধ হয় ভুল হবে। কুটির টাইপের এক একটি পাকা গৃহ। শান্ত, সুন্দর, স্নিগ্ধ পরিবেশ। প্রতিটি গৃহে যাবার বাঁধান রাস্তা। দুপাশে ফুলের বাগান, গাছের ছায়া মনকে আকৃষ্ট করে। আশ্রমের পেছনে খোলা মাঠ। মাঠের পরে বনানী।

গেট থেকে বাইরে বেরিয়ে এলে সামনে উঁচু বাঁধান রাস্তা। রাস্তার ওপারে গঙ্গা। অর্থাৎ সপ্তর্ষি আশ্রমের পূর্বদিকে গঙ্গা। রাস্তা থেকে ঢাল নেমে গেছে গঙ্গা পর্যন্ত। এখানে গঙ্গায় অনেক উঁচু বাঁধান ঘাট রয়েছে। এই ঘাটের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে নজর দিলে দেখা যায় স্রোতগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বিভিন্ন স্রোতের মাঝে মাঝে দ্বীপের মত স্থলভূমি রয়েছে। এমন সাতটি দ্বীপে বসে ঋষিকুল শিরোমণি মহর্ষি ভার্গব, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অত্রী কাশ্যপ এবং গৌতম তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। এজন্যে এ জায়গাটাকে সপ্তদ্বীপও বলে।

অঞ্জলি এবং বিশ্বনাথ চারিদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আমি ওদের ছেড়ে দিয়ে ঘাটের সর্বোচ্চ জায়গাটি বেছে নিয়ে বসে রইলাম। আমার সামনেই সপ্তদ্বীপ। ওখানে বসে সাধনা করেছেন বিশ্বামিত্র। এই বিশ্বামিত্র মুনিকে ভয় করত সকলে। দীর্ঘদিন তিনি বশিষ্ঠ মুনির সাথে নানাভাবে শত্রুতা সাধন করেছেন। অথচ মহর্ষি বশিষ্ঠ ছিলেন শান্ত এবং দয়ালু। এই বিশ্বামিত্রের পরীক্ষার ফলে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। অবশ্য বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সব। আবার এই বিশ্বামিত্রের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পাঠিয়েছিলেন সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নর্তকী মেনকাকে। মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্ম নিল শকুন্তলা। অনেকের মতে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুত্র ভরত। ভরত থেকে ভারত, ভারতবর্ষ।

মনে পড়ে মহামুনি গৌতমের কথা। গৌতমের স্ত্রী অহল্যা ছিলেন অনন্যা সুন্দরী। দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন গৌতমের শিষ্য। সে সময় শিষ্যরা থাকত গুরুগৃহে। গৌতমের অবর্তমানে গৌতমের ছদ্মবেশে গুরু পত্নী অহল্যাকে ভোগ করার দায়ে গৌতমের অভিশাপে অহল্যা হলেন পাষাণী, ইন্দ্র হলেন শ্রীহীন। দীর্ঘকাল অভিশাপ ভোগ করে শ্রীরামের দয়ায় অহল্যা পেলেন মুক্তি। মানবী অহল্যা দেবরাজ ইন্দ্র।

বসে আছি আপন মনে। সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ছে। তার শেষ রক্তিম শিখা পড়েছে এসে সামনে বিস্তীর্ণ সপ্তদ্বীপের উপরে। আমার সামনেই গঙ্গার প্রথম স্রোত পেরিয়ে একটি দ্বীপ। দ্বীপের উপর এক জন সন্ন্যাসী শুয়ে আছেন দীর্ঘক্ষন ধরে। শুয়ে আছেন না সাধনা করছেন দূর থেকে ভাল করে নজরে আসছে না। আগেই বলেছি এদিকটায় সাধু সন্ন্যাসীদের ভীড় বেশী। আমার থেকে সামান্য একটু দূরে কয়েক জন পূর্ব দিকে মুখ করে গঙ্গার পাড়ে পদ্মাসনে বসে আছেন। দূরে বনানীর মাঝেও সন্ন্যাসীদের আনাগোনা লক্ষ্য করলাম। সন্ধ্যা নেমে এল সপ্তদ্বীপের উপর। আলোর খেলা শেষ হয়ে নেমে এল আঁধার। সপ্তদ্বীপ ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে। যাত্রীরা অন্ধকার হবার সাথে সাথেই চলে গেছে। এখানে ওখানে আছে শুধু কিছু সাধক এবং সন্ন্যাসী। বয়ে যাওয়া গঙ্গার কলধ্বনী স্পষ্ট কানে ভেসে

আসছে। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। অঞ্জলি, বিশ্বনাথ সপ্তর্ষি আশ্রমে সন্ধ্যারতি দেখতে গেছে। অন্ধকারে চারিদিকটা ছেয়ে গেছে। ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে দূরের ঐ অরণ্য আর সপ্তদ্বীপের বুক। আমার মত সাধারণ মানুষের চোখে হয়ত যা ধরা পরবে না, তা অনুভব করবেন ধ্যান-মগ্ন ঐ সাধকগণ। পেছনে সপ্তর্ষি মন্দিরে একটানা ঘণ্টাধ্বনিত হচ্ছে সন্ধ্যারতির। একটু কান পেতে শুনলেই যেন শোনা যাচ্ছে বাতাসে সুর বেজে উঠেছে "মন চল নিজ নিকেতনে"। এ সুর শুনলে মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠে। হয়ত ঐ সুর শুনেই ঐ তাপসের দল নিজের নিকেতন খুঁজছেন। ভাবছি আর ভাবছি। মনে ঘোর লেগেছে। লেগেছে ঘোর চেতনায়। কে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দূরে ঐ রহস্যে ঘেরা অন্ধকারে, কানে বাতাসের সুর আসছে। ভয়ে সজোরে কান চেপে ধরলাম। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লাম পাথরের উপর।

অঞ্জলি এবং বিশ্বনাথের ডাকে চেতনা ফিরে এল।

—দাদা উঠুন। উঠুন দাদা, ঘরে ফেরার সময় হল।

উঠে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও কি বলতে চায়? ঘর! কোন ঘর? উঠতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। দেহ কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, পা টলছে। অঞ্জলি আমার অবস্থা লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে।

—দাদা, আপনার কি হয়েছে? শরীর খারাপ হয়েছে? ইস্ গায়ে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আপনার শরীর খারাপ হয়েছে একথা আগে আমায় বলেন নি কেন? তা হলে তো আজ আসতাম না। চলুন যাবার পথে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে যাব।

অঞ্জলি এবং বিশ্বনাথ দুজনে মিলে ধরে আমায় টাঙায় তুলল। আমি বললাম,

—ও কিছু নয়। এতে তোমরা অত বিচলিত হয়োনা। দু'একটা ট্যাবলেট খেলেই সেরে যাবে। ডাক্তারের প্রয়োজন নেই।

টাঙা ফিরে চলেছে দুলকি চালে। সপ্তর্ষি থেকে হরিদ্বার। সপ্তদ্বীপ থেকে হরিদ্বার। কপিল মুনির সাধনার স্থান কপিল স্থান। গঙ্গার নিম্নে অবতরনের স্থলে দাড়িয়ে মুনিরাজ কপিল করেছেন কঠোর সাধনা। শুধু মাত্র কপিল মুনি কেন, অংশুমান ভগীরথ থেকে শুরু করে যুগে যুগে কত সাধক কত মহাত্মার পদধূলিতে ধন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার স্থল হরিদ্বার। মায়া, ব্রহ্মপুরা, কপিল স্থান, হরিদ্বার। যার যেটা ভাল লেগেছে সে সেই নামেই ডেকেছে এই সাধন স্থল কে। এখানে এসেছেন শংকরাচার্য, বিবেকানন্দ, রামানন্দ। আরো কত অসংখ্য মহামানব আত্মা। এসেছেন নানক। সাধনা করেছেন ভোলা গিরি। তীর্থ শ্রেষ্ঠ হরিদ্বার। সাধনার পীঠ ভূমি হরিদ্বার। ভারতের অভিশপ্ত মানবের মিলন ভূমি হরিদ্বার। ষাট হাজার মানব সন্তানের জীবন দায়িনী গঙ্গা আজ কোটির্দ্ধো সন্তানের জীবন দায়িনী রূপে বয়ে চলেছে পুণ্যভূমি হরিদ্বার থেকে। তপোভূমি হরিদ্বার ছেড়ে হয়ত চলে যাব আমার ঐ মর্তভূমিতে। কিন্তু হরিদ্বার থাকবে আমার মনে। থাকবে আমার চেতনায়, দেখব তারে স্বপ্নে।

দশ

ট্রেন চলেছে হরিদ্বার ছেড়ে ঋষিকেশ অভিমুখে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে মনটা খচ্ খচ্ করছে অঞ্জলিদের জন্যে। আসতে চেয়েছিল আমার সাথে এই ঋষিকেশে। পালিয়ে এসেছি। রাত্রের দিকে জ্বরটা বাড়লে ও শেষ রাতে ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়ে যায়। মনে ভাবলাম জ্বর যদি আবার বাড়ে। ওদের বিব্রত করা হবে। তা ছাড়া ওরা আমায় এমনিতে সহজে ছাড়বে না। পালিয়ে এসেছি শেষ রাতে উঠে। টেবিলের উপর লিখে এসেছি আমার কৈফিয়ৎ।

এতক্ষনে ওরা হয়ত পড়েছে আমার কৈফিয়ৎ,। ব্যথা পেয়েছে মনে। ওদের মুখ আমার মানস পটে ভেসে উঠছে বার বার। ওদের ভালবাসার মধ্যে এতটুকু খাদ নেই। দশ বৎসর আগে আমি অঞ্জলিকে যে টুকু সাহায্য করেছি তা নেহাত মানবতা ছাড়া বেশী কিছু নয়। রাস্তায় বিপদে পড়লে হয়ত অনেকেই এর চাইতে বেশী করে। কিন্তু অঞ্জলি তার বিনিময়ে দিয়েছে অনেক। দশ বৎসর মনে রেখেছে। প্রান ঢেলে অকৃত্রিম ভালবেসেছে। দিল্লী যাবার পথে অঞ্জলি আমায় বলেছিল,

—দাদা আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

সে ঋণ অঞ্জলি বিশ্বনাথ শোধ করেছে সুদে মূলে। বরং আজ আমি ওদের কাছে, ওদের স্নেহের কাছে, ওদের ভালবাসার কাছে ঋণী। স্পষ্টতঃই এখান থেকে চোখ বুঝে দেখতে পাচ্ছি, আমার চিঠি পড়ে ওর দুটি বড় বড চোখ থেকে নেমে যাচ্ছে জলের ধারা, আর হয়ত দেখা হবে না ওদের সাথে। অগুনিত মানুষের স্রোতে হারিয়ে যাব আমি। ওরাও যাতে হারিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করেছিলাম। ইচ্ছে করেই ওদের ঠিকানা নেই নি বা আমার ঠিকানা দেইনি। ওরা হয়ত ভাবছে 'দাদা নিষ্ঠুর'। উপায় নেই। পথের পরিচয় আমি পথেই রেখে যেতে চাই। সাথে নিয়ে যেতে চাই শুধু স্মৃতি,। জীবন টাইতো পথ চলা। খালি হাতে পায় চলো। শ্রান্ত হলে পান্থ-শালায় বিশ্রাম নাও। পথ চলা শেষ হলে বাড়ী ফিরে চলো। এত বোঝা সাথে নিলে চলব কি করে? চলার শেষে সাথে থাক বেদনা মধুর কান্না হাসির অজস্র স্মৃতি। ট্রেন চলেছে হরিদ্বার ছেড়ে ঋষিকেশ।

ট্রেন চলেছে ঋষিকেশে। তাকিয়ে আছি বাইরে। দুই ধারের অরণ্য সরে যাচ্ছে পেছনে। দূরে দূরে পাহাড়ের সারি। ঝির ঝির করে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এতক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিলাম আনমনে। একবারও দেখিনি কম্পার্টমেন্টে আর

কে কে আছে। মনের মধ্যে বার বার ঘুরে ফিরে আসছে অঞ্জলি, বিশ্বনাথ বিন্টু, কুন্তির কথা। অঞ্জলি কাঁদছে, বিশ্বনাথ মুখ নীচু করে বসে আছে। কুন্তি থম থমে মুখ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিন্টু অবশ্য এখনও ঘুম থেকে উঠেনি। না, আব ও চিন্তা নয়। ওদের কথা শেষ।

মুখ ঘুরিয়ে দেখি বহু যাত্রীর ভীড। আমার সামনের বেঞ্চের জানালার কাছে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাকিয়ে দেখি আমার দিকে একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। মনে হল আমায় খুঁটে খুঁটে নিরীক্ষা করছেন। কেমন যেন একটা অসস্তি লাগছে আমার। মাঝে মাঝে ঝুঁকে পরছেন তিনি সামনের দিকে। দুই ভুরুর মাঝখানে তারা দুটি উঠে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ভোরের হাওয়ায় বেশ একটু ঠাণ্ডাই লাগছে। সন্ন্যাসীর গায়ে পাতলা একখানা লাল কাপড়। কানে মাথায় গামছা জড়ান। গায়ের কাপড়খানা বার বার জড়াচ্ছেন গায়ে। মাঝে মাঝে ঝিমুচ্ছেন। আমার মনে হল, ওর মনে একটা জ্বালা অনুভব হচ্ছে। তাকে দমন করতে চেষ্টা করছেন। দাডি গোঁফে মুখখানা ভর্তি। সাথে সামান্য একটা ঝোলা আর একটা লোটা। পর পর দুটো অন্ধকার গুহা ছাডিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল ভীমগোডা স্টেশনে। এক ভাঁড চা নিলাম। চায়ে চুমুক দিতে গিয়েই নজরে পড়ল সাধুজী সতৃষ্ণ নয়নে আমার চায়েব ভাঁড়ের দিকে চেয়ে আছেন।

প্রশ্ন করলাম হিন্দীতে,

—আপ চা পিয়েগা ?

কোন উত্তর দিলেন না। মনে ভাবলাম হয়ত দক্ষিণ ভারতীয়, হিন্দী বুঝতে পারছেন না। ইংরেজীতে বললাম,

—**Will you take tea ?**

ঈষৎ হেসে এবার মাথাটা একটু ঝোঁকালেন। আর এক ভাঁড় চা নিয়ে সাধুজীকে দিলাম। এত চা নয়, চা নামক এক পদার্থ। যেমন রং তেমন তার স্বাদ। দু এক চুমুক দিতেই মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল। নেহাৎ গরম। সাধুজী কিন্তু পরম তৃপ্তিতে চুমুকের পর চুমুক দিয়ে চলেছেন।

আমি একটু নড়ে চড়ে বসে প্রশ্ন করলাম,

—**Where is your destination ?**

সাধুজীর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। ঝুঁকে পডে নীচ থেকে ঝোলাটা বের করলেন। ঝোলার মধ্য থেকে ছোট একটা শ্লেট আর একটা পেনসিল বের করে খস্ খস্ করে লিখে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম লিখেছেন ইংরাজীতে।

—**First Rishikesh then Gomuk.**

—Do you know Hindi ?

—yes, but you can speak with me in Bengali.

এবারে অবাক হবার পালা আমার। সাধুজী বাঙালী। হায় ভগবান! এবারে বুঝতে পারলাম তখন কেন হিন্দীতে প্রশ্ন করায় উত্তর দেননি। সাধুজী বুঝতে পেরেছেন আমি বাঙালী। আমি বিস্মিত হলাম।

—আপনি বাঙালী ?

সাধুজী মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন আমার দিকে চেয়ে। অনুমান করলাম সাধুজী মৌনব্রত গ্রহণ করেছেন। বেড়িয়েছেন তীর্থপর্যটনে। ওঁর বয়সটা দেখে আমার মনে নানা চিন্তার উদয় হচ্ছিল। এত কম বয়সে কেন সন্ন্যাস নিলেন উনি ? উনি কি শুনতে পেয়েছেন বাতাসের সুর ? অথবা জীবনের ব্যর্থতা ওকে টেনে এনেছে এই পথে ? ইচ্ছে হয় দু' একটা প্রশ্ন করি। আবার ভাবলাম সন্ন্যাসীরা পূর্বজীবন সম্পর্কে কিছু বলেন না। পূর্বজীবন তাদের কাছে বাসী কাপড়। আমি আর প্রশ্ন করলাম না।

যাত্রীদের ভীড়, কোলাহল, চিৎকার, বচসা সব মিলিয়ে কম্পার্টমেন্টে যেন হাট বসে গেছে। তাকিয়ে দেখি চল্লিশ বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সের একজন বাঙালী ভদ্রলোক চিৎকার করে চলেছেন। তার সাথে পাল্লা দিচ্ছেন আর একজন অবাঙালী—একজন বলছেন বাঙলায়। আর একজন হিন্দীতে। একে অপরের ভাষা বুঝতে না পেরে আস্ফালন করে চলেছেন। বচসার মূল বিষয় স্থানাভাব। অবাঙালী ভদ্রলোকের স্ত্রী পা তুলে অহেতুক কিছুটা স্থান দখল করে আছেন। বাঙালী ভদ্রলোকের স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। তা বলতে গিয়েই রাম রাবণের যুদ্ধ। বাঙালী ভদ্রলোক হিন্দী বোঝেন না। বলেন যা, তার শেষে একটা 'গা' যুক্ত করে দেন অথবা 'হ্যায়'। আমি তাকে বললাম,

—কি হয়েছে ? আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?

—কি কন মশায়, উত্তেজিত হমুনা ?

এতক্ষণ ভদ্রলোকের নজর ছিল না আমার দিকে। আমার মুখ থেকে বাংলা কথা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

আপনি মশায় বাঙালী ? তাইলে এতক্ষণ চুপকইর‍্যা আছিলেন কেন ? মজা দ্যাখতে আছিলেন ? তা তো দেখতেছিই। এইজন্যই কয় বাঙালীগো মধ্যে একতা নাই। আর আগো কিছু কইলেই যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল।

ভদ্রলোক এমন ভাবে হাত পা ছুঁড়ে কথাগুলি বললেন যে, আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। আমার হাসি দেখে উনি আরো চটে গেলেন।

—আপনে তো হাসলেনই। হাসবেন না? যদি পড়ত আপনার ঘাড়ে, তইলে বোঝতাম মশায়।

—আমি হেসে বললাম,

—আজ্ঞে আমি তার জন্যে হাসিনি। বা মজাও দেখছি না। আমি হাসছি আপনার হিন্দী কথা শুনে।

এতক্ষণ ভদ্রলোকের স্ত্রী ভীত হয়ে স্বামী বেচারাকে থামাবার চেষ্টা করছিলেন। আমার কথা শুনে একটু মুচকি হেসে মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিলেন। ভদ্রলোকের 'গা' আর 'হায়' প্রয়োগের হিন্দী শুনে তিনি হাসবেন না, তার চিৎকার থামাবেন?

—দ্যাখেন ঐ হিন্দী আমি কইতে পারি না। কিন্তু শিয়ালদায় ঐ রকম করলে আমি কি করে গা?

ভদ্রলোক, অবাঙালি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আবার হাত পা ছুঁড়লেন, অবাঙালী ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে আমাদের কথা বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে হাত পা ছুঁড়তে দেখে আবার ক্ষেপে গেলেন।

—ফির আপ হামকো গন্ধা বাত বোলেগা তো ছোড়েগা নেহি। ভদ্রলোক আস্তিন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—কি, মারবি নাকি? তাইলে আমিও ছাইর‍্যা দিমুনা। চড়াইয়া তোর গাল কাটাইয়া দেগা।

এক্ষুনি গজ কচ্ছপের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বললাম,

—থামুন, থামুন বলছি। কি আরম্ভ করেছেন?

অবাঙালী ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললাম,

—আপ ঝুট মুট চিল্লাতা হায় কিঁউ? উনোনে আপকো কুছ গন্ধা বাত নেহি বোলা। আপ শান্তিসে বৈঠযাইয়ে। উনলোক কো বাত আপ সমঝা নেহি। ইসিলিয়ে আপ গোসা হোতা হায়। লেকিন উনোনে বলতা হায়, আপ বহুত আচ্ছা আদমী।

ব্যাস, উত্তাল দুধে জল পড়ে গেল। আমার ধমক খেয়ে দুজনেই চুপ করে গেল। অবাঙালী ভদ্রলোক একগাল হেসে দিয়ে হাত জোড় করে ভদ্রমহিলাকে বললেন,

—ঠিক হায়। ঠিক হায়। ইসিলিয়ে হাম মাফি মাঙতা হায়। আপ বৈঠযাইয়ে। বাঙালী ভদ্রলোক তার জোড় হাত দেখে ভদ্রলোকের পিঠে হাত রেখে বললেন,

—ঠিক হায়। ঠিক হায়। আপনি কিছু মনে করেগা নেহি।

আমি হেসে ফেললাম।

—বৌদি আপনি বসুন ওখানে।

ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত: করে বসে পড়লেন। বাঙালী ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট এবং দিয়াশলাই বের করলেন। নিজে একটা তুলে নিয়ে অবাঙালী ভদ্রলোকের দিকে একটা এগিয়ে দিলেন।

—নেন, একটা খাইয়ে গা।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরো একটু সরে বসে বাঙালী ভদ্রলোকের হাত ধরে বললেন,

—আপভি বৈঠযাইয়ে।

আমি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলাম। মাত্র একটা সিগারেট নজরানায় বসার জায়গা মিলে গেল। আজকাল দেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নজরানা না দিলে নজর করা যায় না। যিনি দিতে পারেন, সকলের নজরে পড়েন। আর যিনি দিতে পারলেন না, পড়ে পড়ে মার খেলেন। এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। চায়ের টেবিলে অনেক তুফান উঠেছে। কিন্তু সে ঐ চা খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত। তারপরেই যে-কে সেই। হয়ত যারা তুফান তুলে দিলেন তাদের মধ্যেই দু-একজন নজরানা ব্যাতিরেকে এক কদমও বাড়াবেন না। একই অফিসে চাকরী করে কেউ তুলছে বাড়ী, কেউ মেয়ের বিয়েতে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করছে। আর একজন দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে আত্মহত্যা করছে। এ আলোচনা থাক। এটা এখন সকলের গা সহা হয়ে গেছে।

সাধুজী এতক্ষণ এদের দেখছিলেন। এবার আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু হেসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি মনোযোগ দিলাম বাঙালী ভদ্রলোকের দিকে। আমি বললাম,

—আপনি কোথায় যাবেন?

—হৃষিকেশ। আপনে?

—আমিও হৃষিকেশ যাব। আপনি হৃষিকেশে কতদিন থাকবেন?

—কিছু ঠিক করি নাই। সাত আটদিন তো থাকুমই। দ্যাখেন আমি হইলাম গিয়া হিসাবী মানুষ। বেহিসাবে কিছু ব্যয় করি না।

অনেক টাকা পয়সা যখন খরচা কইর‍্যা আইছি। তখন হরিদ্বার আর হৃষিকেশে একমাস তো থাকুমই,

—আপনি বুঝি কোন অফিসের এ্যাকাউনটেন্ট?

—আইজ্ঞে না। ব্যবসা করি, ব্যবসা। কাকদ্বীপের লঙ্কা কিনি কইলকাতায়

বিক্রি করি। নিজের জরী আছে, গুদাম আছে। এতে যা হয় ঠাকুরের দয়ায় চলইয়্যা যায় আমাগো দুইজনের।

—কেন, আপনার ছেলেমেয়ে?

—আইজ্ঞে, আমাগো কোন পোলা মাইয়া হয় নাই। পেরথম পেরথম মোনটায় খুব দুঃখু হইত। পরে চিন্তা করলাম না হইয়া ভালই হইছে। হইলে তো, একটা হইত সণ্ডা, আর একটা হইত গুণ্ডা, আর একটা হইতো মোস্তান। যদি বোঝে বাবার টাকা আছে, তাইলে তো রক্ষা নাই। আর মাইয়া হইলে তো কথাই নাই। বিয়ার আগে পাড়ার ছ্যামরাগো 'কাবু', 'ভেঠু' ডাকার ঠেলায় অস্থির হইতাম। বিয়ার সময় জামাইর জন্ম হইতে সপিণ্ডিকরণের খরচা দিতে হইত। না হইয়া ভালই হইছে মশায়।

বৌদির দিকে তাকিয়ে দেখি লজ্জায় মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি হাসতে লাগলাম। বললাম,

—কতদিন ধরে ব্যবসা করছেন?

—পেরায় কুড়ি বৎসর। ইস্কুল ফাইনাল পাশ করলাম দুইবারে। বাবা কইল 'তোর পড়াশুনা হইবে না, চাকরির চেষ্টা কর।' চিন্তা কইর‍্যা দেখলাম, এই বিদ্যায় চাকরি হইবে না। আমাগো তো আর বড় বড় 'মামা' 'পিসা' নাই। আরম্ভ করলাম মরিচের ব্যবসা। মা লক্ষ্মী দয়া কইর‍্যা দিলেন দু'পয়সা। আয় মোন্দ হয় না।

—যদি আয় ভালই হয়, তবে সে পয়সা দিয়ে করেন কি? প্রশ্নটা করেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। এভাবে কথাটা ঠিক হয় নি। বললাম,

—মাপ করবেন। এভাবে কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরে হো-হো করে হাসতে শুরু করলেন।

—মাপ করমু ক্যান? আপনে তো অন্যায় কিছু কন নাই। এই গুরুচরণ দত্ত, কেউ অন্যায় কইলে ছাইর‍্যা দেওয়ার পাত্তর না। তয় শোনেন, যা আয় করি আমাগো দুইজনের হইয়াও যা থাকে, আমার ভাইপোলাগো দি। ইস্কুলে, হসপিটলে দি।

কথাটা বলেই দত্তবাবু লজ্জা পেলেন। ইস্কুলে, হসপিটালের কথা ভদ্রলোক বলতে চান নি। বার বার আমতা আমতা করছিলেন। এবারে অবাক হবার পালা আমার। যে হিসাব আমাকে দিলেন, এমন সহজ সরল হিসাব আজকাল অনেকেই দিতে পারেন না। ভদ্রলোকের প্রতি আমার সভ্রম বেড়ে গেল।

—আপনার নাম বুঝি গুরুচরণ দত্ত?

—বাবার দেওয়া নাম চরণ দত্ত। আমি ওর লগে একটা 'গুরু' যোগ করছি।

—আপনি বুঝি বৌদিকে নিয়ে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছেন ?

—হ। না বাইরইয়া করুম কি ? আমাগো পিছনে ডাকপারও কেউ নাই, আর ভাববারও কেউ নাই। সোময় পাইলেই বাইরইয়া পরি তেনারে ছাখতে ? বলতে বলতেই হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন দত্তবাবু। আবার বলতে শুরু করলেন,

—প্রত্যেক বছরই বাইরই। এই তো গেল বৎসর গেছিলাম গয়া কাশী। তার আগের সালে কামরুপ কামাক্ষ্যা। সারাটা বছর হিসাব করতে করতে মাথাটা গোলমাল হইয়া যায়, অমনে বাইরইয়া পরি।

—অনেক তীর্থ তো ঘুরলেন, কোন তীর্থ আপনাকে বেশী আকর্ষণ করে ?

দত্তবাবু আমার প্রশ্ন শুনে আমার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যেন আমি কোন অপরাধ করে ফেলেছি।

—মশায় আপনে কি হিন্দু ?

কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বললাম,

—আজ্ঞে বামুন।

—বামুন না ছাই। বামুন হইলে কি কেউ এমন কথা কয়। তীর্থের আবার বড় ছোডো আছে নাকি। ধরেন, আপনার বাবার দুইখান দুইরকম পোষাক পরা ছবি আছে। আপনে কোনখানরে বড় মনে করবেন ? আর কোনখানরে ছোডো মনে করবেন ? কন তো দেখি ?

দত্তবাবু নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন। আমি আহত হলেও লজ্জায় মাথা নীচু করলাম। দত্তবাবু সেটা লক্ষ্য করে বললেন—আহাহা! লজ্জার কিছু কই নাই। লজ্জা পান ক্যান ? আমি একটু রসিকতা করলাম। কিছু মনে কইরেন না। আপনারা হইলেন গিয়া বামুন মানুষ। তার উপর আবার ল্যাখাপড়া শেখছেন। আপনাগো লগে কি আর আমাগো তুলনা হয়।

মনে ভাবলাম দত্তবাবুর কথাটা কিছুটা রুঢ় হলেও সত্য। যারা প্রকৃত ভগবতপ্রেমী বা ঈশ্বর বিশ্বাসী, তাদের কাছে সবই এক। পুরীর জগন্নাথ, কাশীর বিশ্বনাথ, আর হরিদ্বারের হর একই। প্রভেদ করেন তারা, যারা অবিশ্বাসী। জ্ঞান যাদের সীমাবদ্ধ। এটা যদি দত্তবাবুর উপলব্ধি হয় তবে তো তিনি এগিয়ে গেছেন অনেক। গল্পে পড়েছি সরল বিশ্বাসে গয়লানী হেঁটে নদী পেরিয়ে গেছে। আর পণ্ডিত জলে ডুবে মরেছে। মনে মনে দত্ত বাবুকে প্রশংসা না করে পারলাম না। একদিকে প্রচার বিহীন দান, আর একদিকে সোজা সরল জ্ঞান। এযে একটি রত্ন। মনে মনে বলি, চরণের আগে 'গুরু' যুক্ত করে ঠিকই করেছেন।

ট্রেন ঋষিকেশ স্টেশনে দাঁড়াতেই বহু যাত্রী আমাদের নামতে না দিয়েই হুড়মুড়

করে উঠতে শুরু করে দিল। ফলে ধাক্কা ধাক্কি চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। অনেক ধস্তা ধস্তির পরে বৌদি এবং দত্ত বাবুকে নিয়ে স্টেশনে নেমে পড়লাম। দত্তবাবু আমার দিকে ঘুরে বললেন—আপনে তো একলা মানুষ। আমাগো ও অবশ্য কোন ঝনঝাট নাই। আয়েন না আমাগো লগে, একলগেই ঘুরমু।

—বেশ চলুন।

স্টেশন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলে খোলা মাঠ। মাঠে টাক্সি টেম্পো দাঁড়িয়ে আছে। সারা উত্তর এবং পূর্ব দিকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঋষিকেশ পাহাড়। পাহাড় আমায় আকর্ষণ করে বেশী। পাতলা কুয়াশার একটা আস্তরণ ঢেকে রেখেছে পাহাড়ের চূড়াগুলোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি সেই দিকে। পাহাড়ের কোলে ঋষিকেশ। ভারী অপূর্ব লাগছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি 'পাহাড়' কথাটা ব্যবহার করছি। যদিও ছেলে বেলায় পাহাড় আর পর্ব্বতের পার্থক্য সম্পর্কে পড়েছি। এ ত্রুটি পাঠক শুধরে নেবেন দয়া করে। সংঘা অনুসারে হিমালয়কে পর্ব্বত বলে। আর হরিদ্বার থেকে সবই তার বাচ্চা কাচ্চা, নাতি, নাতনীর দল বিরাট সংসার পেতেছে ভারতের গোটা উত্তর দিকটা ঘুরে। এখানে পাহাড় কথাটা শুনতে ভাল লাগছে, তাই বলছি। এটা অবশ্যই ঠিক নয়। দত্তবাবু আমার হাতটা ধরে বললেন,

—ও ভাবে হা কইর‍্যা কি ছাখেন?

—কিছুনা। চলুন।

স্টেশন ছেড়ে বাইরে আসতেই কিছু টাঙ্গাওয়ালা এবং টেক্সি ড্রাইভার আমাদের কে ছেকে ধরল। দত্তবাবু আমার হাত ধরে বললেন,

—আসেন, আগে একটু চা খাই তার পরে যামু।

সামনেই কয়েকটি চায়ের দোকান খাবারের দোকান রয়েছে। আমরা তার মধ্যে একটা বেছে নিয়ে বসে পরলাম। চা খাওয়া হলে আমি পকেট থেকে পয়সা বের করে দোকানদারকে দিতে যেতেই দত্তবাবু প্রবল বাধা দিয়ে বললেন—চা এর দাম আপনার দিতে হইবে না। আমিই দিমু। ছাখেন না, সারাটা জীবনতো হিসাব করতে করতেই গেলাম। সোমায় সোমায় না হয় এট্টু বেহিসাবী হলাম। অনেক পয়সা তো কামাই করলাম। মইর‍্যা গেলে খাইবে কেডা? অমন বমনো ও করবে না। যতুক্ষন আমার লগে আছেন, আপনার সব খরচাই আমার।

এত দেখছি আর এক বিপদে পড়াগেল। এ ধরণের প্রস্তাব কোন মতেই আমার পক্ষে মানা সম্ভব নয়। হেসে আপত্তি করে বললাম,

—না না। তা কি করে হয়? তা হলে এখান থেকেই আমায় ছেড়ে দিতে হবে।

মনে হল আমার কথায় দত্তবাবু এবং দত্তবাবুর স্ত্রী দুজনেই আহত হলেন। দত্তবাবু অপেক্ষা দত্তবাবুর স্ত্রীর বয়স অনেকটা কম বলেই আমার মনে হল। চেহারার মধ্যে একটা লাজুক লাজুক ভাব রয়েছে। কথা কম বললেও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং শান্ত। মুখে সর্বদা একটা স্নিগ্ধ হাসি লেগে রয়েছে। গায়ের রং ফর্সা, নাকটা খানিকটা থ্যাবরা হলেও বেমানান নয়।

দত্তবাবু অর্থাৎ গুরুচরন দত্তের চল্লিশ বেয়াল্লিশ বৎসর বয়স হলে ও দেখে বোঝা যায়না। বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য। মুখে সারল্যের একটা ছাপ রয়েছে। চোখের উপরের পাতায় মাংস কিছুটা বেশী, কথা বলেন অনর্গল, পরনে দামী ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে পামসু চেহারার দিকে তাকালে মনে হয় কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন। যখন কথা বলেন তখন খুব একটা চিন্তা ভাবনা করেন না। আর এই গুণটাই দত্তবাবুর স্ত্রীর অপছন্দ। দত্তবাবু স্ত্রীকে উপেক্ষা না করলে ও সমীহ করেন না। বাইরে থেকে দেখলে ওরা সুখী।

দত্তবাবুর স্ত্রী এতক্ষন কোন কথা বলেন নি। আমার কথা শুনে আহত স্বরে বললেন, আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে,

—আপনি আমায় বৌদি বলে ডেকেছেন। অথচ তার সম্মানটুকু দিলেন কই? ওটা কি তাহলে কথার কথা।

আমি মাথা নীচু করে রইলাম। দত্তবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। তার স্ত্রীর কাছে আমার এই পরাজয় টুকু তিনি বেশ উপভোগ করছিলেন।—দ্যাখলেন তো, আমার ধারে যেতলেও, আসল যাগায় হাইর্যা গেলেন। আরে ওরা হইছে গিয়া মহামায়ার যাত। হারতেই হবে, পুরুষেরা সব সময় মাইয়া হেইলা গো ধারে হাইর্যাই যায়। দ্যাখেন নাই, স্বয়ং শিব কেমন কালীর পায়ের তলায় শুইয়া ড্যাব ড্যাবইয়া তেনার মুখের দিকে চাইয়া আছেন?

দত্তবাবু আপন মনে প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন। দত্তবাবুর স্ত্রী লজ্জা পেয়ে মৃদু হেসে দত্তবাবুকে ধমক দিলেন।

—তুমি একটু থামতো।

প্রসংগ পাল্টাবার জন্যে আমি বললাম,

—তা হলে এখন কি আমরা টেক্সিতে যাব? না টাঙায়?

—টাঙায়ই চলুন ঠাকুরপো। টাঙায় চড়া আমার ভীষণ শখ। তা ছাড়া বেশ দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

দত্তবাবু আবার টিপ্পনী কেটে উঠলেন।

—টাঙায় চাপতে শখ হইবে না কেন? ঘোড়ায় চাপতে কার না শখ যায়।

খাইয়া ছেইলারা যদি একবার ঘোড়ায় জিন দিতে পারে তইলেই হইছে কাম। যাউক ঘোড়ায় না চাপ টাঙায় তো চাপ। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাও।

আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম। আমি একটা টাঙা ভাড়া করে নিয়ে এলাম। আমি সামনের দিকে আর দত্তবাবু এবং তার স্ত্রী পেছনের দিকে উঠলেন। মনে হল অঞ্জলি বিশ্বনাথ নেই অথচ তাদের স্থান দখল করেছেন দত্তবাবু এবং তার স্ত্রী। হরিদ্বারে অঞ্জলিদের সাথে দেখা হবার পর আমার এতটুকু অসুবিধা ওরা ঘটতে দেয়নি। ওরা আসতে চেয়েছিল আমার সাথে হৃষিকেশ। একা চলব বলে ভয়ে পালিয়ে এসেছি শেষ রাতে উঠে। বরাতে জুটল না। হৃষিকেশে এসে জুটল এঁরা পথের সাথী। আস্তে আস্তে কখন এই পথের সাথী অঞ্জলি বিশ্বনাথের মত মনের মধ্যে এদের আসন করে নেবে বুঝতেও পারব না। বুঝতে পারব ছেড়ে গেলে। যেমন বুঝছি অঞ্জলি বিশ্বনাথের আকর্ষণ। শুধু মানুষ কেন? স্থানের বেলায় বস্তুর বেলায়ও এটা ঘটে। জামাটা যে ভাবে খুশী ব্যবহার করছি। যদি হারিয়ে যায়। আমার জামাটা ভাল ছিল। এই যে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, আছি দেখছি, ঘুরছি, অবাক হচ্ছি, ফিরবো ফিরবো করছি। যে দিন ফিরব, বিদায় নেব হরিদ্বার হৃষিকেশ থেকে বুঝতে পারব কত মায়া, কত ভালবাসায় জড়িয়ে রেখেছিল এরা আমায়। একেই বলে মায়া।

কে বলে জগতে স্নেহ নেই? ভালবাসা নেই? হাসি নেই? আনন্দ নেই? সব আছে। সব আছে জগৎ জুড়ে। তবে একটাকে ছেড়ে অপরটাকে পাওয়া যায় না। হাসির সাথে কান্না। স্নেহের সাথে বঞ্চনা। ভালবাসার সাথে দহন। পুণ্যের সাথে পাপ। সুখের সাথে দুঃখ। মায়ার সাথে বিরহ। দুটোকেই গ্রহণ করতে হবে। শুধু সুখ সুখ করে চ্যাঁচালে দুঃখটাই তেড়ে আসবে শুধু। অতএব চল এবার জীবন টাঙা দুলকি চালে। প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে করতে লছমন ঝুলা অভিমুখে।

হৃষিকেশ হরিদ্বারের মত বড় নয়। হরিদ্বারের মত অত তীর্থযাত্রীর ভীড়ও নজরে পড়ে না। হরিদ্বারের কোলাহল, সাইকেল, রিকসা, টাঙার ভীড় এখানে কিছুটা অনুপস্থিত। তীর্থযাত্রীরা হৃষিকেশ ছেড়ে গিয়ে ভীড় জমায় লছমন ঝুলায়। গঙ্গার দুই তীরে হৃষিকেশ আর লছমন ঝুলা। হরিদ্বারের মত হোটেল ধরমশালাও এখানে অত নেই। এই হৃষিকেশ হয়েই চলে গেছে কেদারবদ্রী যাবার রাস্তা। একপাশে গঙ্গার প্রবাহ। অপর পাশে পাহাড়। পাহাড়ের গা ঘেঁসে ঘুরে ঘুরে রাস্তা উঠে গেছে উঁচুতে। অনেক উঁচুতে। ঐ পাহাড় গুলির মাথায় এপাশে গভীর খাদ। দেওদার, পাইন, সাল প্রভৃতি লম্বা লম্বা গাছে পাহাড়ের রং হয়েছে সবুজ। দূরে পাহাড়ে গায়ে নীল কুয়াশার পাতলা আস্তরণ। নানা রকম পাখীদের কলগুঞ্জন। সাদা খণ্ড খণ্ড মেঘের আনাগোনা। থেকে থেকে ময়ূরের ডাক। শাপের মত এঁকে বেঁকে উপরে

উঠে গেছে ছায়াঘন পীচ ঢালা রাস্তা। নীচে তাকালেই কল কল খল খল শব্দে খেয়ে চলেছে পাক খেয়ে খেয়ে সতত্তঃ ব্যস্ত মাতা গঙ্গা। ওপারে ছবির মত পাহাড়ের কোলে লছমন ঝুলা। সব মিলিয়ে চমৎকার। ভারী অপূর্ব প্রকৃতির শোভা।

বৌদি ঘুরে আমায় প্রশ্ন করলেন,

—এখানে দেখবার জিনিস কি কি আছে ?

—আমি সবটা আপনাকে বলতে পারব না। হরিদ্বার, ঋষিকেশ, মথুরা বৃন্দাবনে যে কত মন্দির আছে সঠিক ভাবে তা বলা যায় না। তবে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হচ্ছে, লক্ষণ মন্দির, ভরত মন্দির, গঙ্গা মন্দির, গণেশজী, হনুমানজীর মন্দির, টিকারী মন্দির, তপোবন, স্বর্গাশ্রম, গীতাভবন, পরমার্থ ভবন। এছাড়াও আরো অনেক মন্দির, আশ্রম এবং আখড়া ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্ততঃ। সকলেই বলে আমি আদি, আমি অকৃত্রিম। ঋষিকেশে স্থায়ী বাসিন্দাদের ভীড় বেশী। লছমন ঝুলায় তীর্থযাত্রী।

আমরা যে টাঙায় চেপেছি তার ঘোড়াটা যেমন তেজী তেমন কিছুটা পাগলাটে ধরণের। টাঙাওয়ালা তাকে বাগে আনতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বারবার। কখন কখন অশ্বমহারাজ দাঁড়িয়ে পরলেন। কখন বা প্রচণ্ড জোরে ছুটতে শুরু করলেন। আমরা তখন অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছি। যেতে বাঁদিকে উঁচুপাহাড আর ডান দিকটা খাড়া ঢাল হয়ে নীচে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। অর্থাৎ রাস্তা ছেড়ে গড়ালেই সোজা গঙ্গায় আশ্রয় লাভ।

অশ্বমহারাজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন জানান না দিয়ে। প্রথমে চলল তার তোয়াজ খোসামোদ। অবশেষে ধৈর্য্য হারিয়ে বেত্রাঘাত, চাবুকাঘাত। ব্যাস, এমন জোরে ছুটলেন এবার মহারাজ যে টাঙার একটা চাকা ঢালে নেমে গেল। টাঙা কাত হয়ে পড়ল। নেহাত জোর বরাত। টাঙা গিয়ে ঠেকল একটা বড পাথরের গায়ে। চাকা একটা গেল ভেঙে। বৌদি আর্ত চিৎকার করে মূর্ছা গেলেন। আমি, দত্তবাবু এবং টাঙাওয়ালা লাফিয়ে পড়ে টাঙা টেনে ধরলাম। বহু পুণ্য ফলে একটা বড় রকম দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলাম বটে। তবে বৌদির চোখে মুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হল।

বেচারা টাঙাওয়ালা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বেকুব বনে গেছে, একবার ছুটে জল আনছে, একবার হাত জোড় করছে। দত্তবাবু রেগে গিয়ে টাঙাওয়ালাকে তেড়ে গেলেন। আমি তাকে ধরে বললাম,

—ও বেচারার দোষ কি ? ও তো ইচ্ছে করে করেনি। ওর ও তো টাঙার ক্ষতি হয়েছে। আর তা ছাড়া দুর্ঘটনা ঘটলে কি ও বাদ যেত ?

দত্তবাবু আরো রেগে গিয়ে বললেন,

—কি করব মশায়। ও মরত নাকি। লাফ দিয়া পলাইয়া যাইত। মরতাম আমরা।

—ওর ঘোড়াটা পাগলা।

—জাইন্যা শুইন্যা পাগলা ঘোড়া লইয়া ভাড়া লইতে আইছে কেন ?

টাঙাওয়ালা আর্তনাদ করে উঠল,

—নেহি বাবুসাব নেহি। হামারা ঘোড়া পাগলা নেহি আছে। পৃথ্বীরাজ কা বাচ্চা আছে। এইষা মাফিক পৃথ্বীরাজ তামাম ঋষিকেশ মে আউর এক ভি নেহি হ্যায়। লেকিন উসকা বহুত ভুখ লাগা। ইসলিয়ে গরবর করতা হ্যায়।

বলতে বলতে টাঙাওয়ালার চোখটা ছলছল করে উঠল। ছেলেটির বয়স খুব বেশী হবে না। বাইশ তেইশ বৎসর হবে। শক্ত-সামর্থ চেহারা। মুখে সরলতার ছাপ। দেখলে মায়া লাগে। দরদর করে সর্বাঙ্গ থেকে ঘাম ঝরে গায়ের হাতকাটা গেঞ্জিটা ভিজে গেছে। পরনে নীল রঙের লুঙ্গি, বেশ লম্বা।

—অরে আমি পুলিসে দেগা।

আমি হেসে বললাম,

—আমরা যখন মরিনি তখন আর শুধু শুধু রাস্তায় ঝামেলা করে লাভ কি ? ছেড়ে দিন। ওরও অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। গরীব বেচারা।

দত্তবাবু থমকে গেলেন। মুহূর্তমধ্যে রাগ পড়ে গেল। বোধ হয় কোন দুর্বল স্থানে আমি হাত দিয়ে ফেলেছি।

—যা ভাল বোঝেন করেন। অরে ভাড়ার টাকাটা দিয়া দি কেমন ? কিন্তু আমরা যামু কেমনে !

বৌদি একটু সুস্থ হয়ে বললেন,

—আমরা আর টাঙায় যাব না ঠাকুরপো। এখান থেকে আর কতদূর ?

—বেশীদূর নয়। হেঁটে যাওয়া যাবে।

—বেশ, ওকে তাহলে ছেড়ে দিন। আমরা হেঁটে যাব।

দত্তবাবু টাঙার ভাড়া মিটিয়ে দিতে গেল। টাঙাওয়ালা যুবক দু'পা পিছিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললে ওর গাড়োয়ালী ভাষায়,

—আমায় মাপ করে দিন বাবুজী। ভাড়া আমি লিতে পারব না।

আমি বললাম,

—কেন ? তোমার তো কোন দোষ নাই।

—নেহি বাবু। আমি তো আপনাদের জায়গামত পৌঁছে দিতে পারিনি।

অবাক হয়ে গেলাম। সহজ সরল মানুষ। বিবেকে বেধেছে। চুক্তিভঙ্গ হয়েছে

বলে ভাড়া নেবে না। আমি মনে মনে বললাম, সাবাস তুমি টাঙাওয়ালা। তোমার যে বিবেক আছে আমাদের অনেকেরই তা নেই। তোমার ঐ বিবেক থেকে যদি আমরা যারা বিবেকহীন তাদের একটু ধার দাও তবে অনেক সংসারই সুখের হবে।

—তোমার নাম কি ?

—রূপ সিং।

—শোন রূপ সিং। ভাড়াটা নিলে তোমার কোন অপরাধ হবে না। তাছাড়া তোমার তো গাড়ী মেরামত করতে হবে। ভাড়া হিসাবে না নাও, মনে কর তোমায় মিষ্টি খেতে দিচ্ছি।

দত্তবাবু আবার রেগে গেলেন। আর রেগে গেলেই 'গা' আর 'হায়' প্রত্যয় অত্যধিক প্রয়োগ হতে থাকে।

—তুমি ভাড়া না নিলে পুলিশে দেগা।

অবশেষে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে একরকম জোর করে টাকাটা গছিয়ে দেয়া হল আমরা হাসতে শুরু করলাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি টাকা হাতে রূপ সিং আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম রূপ সিং হয়ত ভাবা আমরা বোকা। আমরা ভাবছি রূপ সিং বোকা। আসলে হয়ত আমরা উভয়েই বোকা।

সকালের ঝিরঝিরে হাওয়ায় হাঁটতে বেশ ভালই লাগছিল। গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছি আমরা লছমন ঝুলার দিকে। আমি বৌদিকে প্রশ্ন করলাম,

—আচ্ছা বৌদি, টাঙা যখন খাদে পড়ে যাচ্ছিল তখন কার কথা আপনার মনে হয়েছিল ?

বৌদি একটু মুচকি হেসে বলল,

—কেন আপনার দাদার কথা।

—না, হল না। আপনি ঠিক বলেননি।

—তবে কার কথা ?

—আপনার নিজের কথা।

আমার কথা শুনে দত্তবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন। আমি বললাম,

—এইটাই স্বাভাবিক। মানুষ প্রথম ভালবাসে নিজেকে। নিজের দেহকে। তারপর স্বামী পুত্র ইত্যাদি সব। ভগবানের স্থান অনেক পরে। আর যখন নিজের পরেই যিনি ভগবানকে ভালবাসতে পারেন, তখন তিনি হন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

দত্তবাবু এবং বৌদি কি বুঝলেন জানি না। তবে থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি হেসে বললাম,

—কি হোলো? দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? চলুন।

আমরা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছি। কিছুটা টাঙায় এসেছি, কিছুটা হেঁটে। এবার নীচে নামার পালা। এখানে রাস্তা দুটো ভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকে একটা চলে গেছে বাঁক খেয়ে খেয়ে কেদার বদ্রীর দিকে। ডাইনে নেমে লছমন ঝুলার রাস্তা। এই মুখ পর্যন্ত টাঙা আসে। কিন্তু প্রাইভেট গাড়ী, ট্যাক্সি ইত্যাদি আরো নেমে যায় নীচে ঝুলার মুখের কাছে। তবে এখান থেকে হেঁটে গেলে অনেক মন্দির দর্শন করা যায়।

এখানে মাছের এবং রামের অনুচরদের খাবার বিক্রি হচ্ছে। শুনেছিলাম রামের অনুচরগণ এখানে অবাধে চলাফেরা করে। তাদের সন্তুষ্ট না করলে তারা হাঙ্গামা বাধাতে পারে। অতএব ট্যাক্স আগেই প্রস্তুত রাখা দরকার। দু প্যাকেট খাবার কিনে নিলাম।

লক্ষ্মণ মন্দিরে প্রবেশ করতেই বৌদি প্রশ্ন করলেন,

এটা কিসের মন্দির ঠাকুর পো?

—লক্ষ্মণ মন্দির।

দত্তবাবু প্রশ্ন করলেন,—লক্ষ্মণ মন্দির নাম হইল ক্যান?

মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। লক্ষ্মণ মন্দিরের কথা না হয় কিছু কিছু জানি। কিন্তু এই ভাবে যদি সব মন্দিরে ঢুকে প্রশ্ন করেন, তবে? তবে তো বিপদে পড়ে যাব। সব মন্দিরের কথা তো আমার জানা নেই। মুখে বললাম,

পুরাণে বর্ণিত আছে, রাম রাবণে প্রবল যুদ্ধ হবার পর রাবণ হলো স্ববংশে নিহত। কিন্তু রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মণ বধ করেছিলেন রাবণ পুত্র মেঘনাদকে। রাম রাজ্য লাভের পর লক্ষ্মণ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। মহর্ষি বশিষ্ট ছিলেন অযোধ্যার কুলো-পুরোহিত। রামচন্দ্র স্মরণ নিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠের। বশিষ্ঠ বিধান দিলেন লক্ষ্মণকে, এই ঋষিকেশে এসে মহাদেবের তপস্যা করতে। অবশ্য সপ্তর্ষিতে যখন গেছেন তখন মহর্ষি বশিষ্ঠের মূর্তি দেখেছেন নিশ্চয়ই। ঐ সপ্তদ্বীপে বসে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন তিনি। তাই তিনি বোধ করি স্থান নির্বাচন করলেন এই ঋষিকেশ।

লক্ষ্মণ দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করেছিলেন মহাদেবের। মহাদেব লক্ষ্মণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণকে দর্শন দেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন লক্ষ্মণকে, এই মন্দিরে তিনি অবস্থান করবেন চিরকাল লক্ষ্মণেশ্বর শিব নামে। লক্ষ্মণের নামের সাথে জড়িত হয়ে থাকলেন মহাদেব।

বৌদি গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন। দত্তবাবুও তাকে অনুসরণ করলেন। বৌদি প্রণাম করে উঠে আমায় বললেন,

—এখানে পূজো দেবার বন্দোবস্ত নেই ঠাকুর পো ?

—আমি ঠিক জানি না। তবে মন্দির যখন, তখন অবশ্যই থাকবে। আমি দেখছি।

মন্দিরে দানের বাক্সের সামনে পাণ্ডা রসিদ বই নিয়ে বসে আছে। আমি তার কাছে সব বলতেই সে একজন লোককে ডেকে সব বন্দোবস্ত করে দিতে বলল। আমি দত্তবাবুকে টাকা দিতে বললাম। দত্তবাবু টাকা বের করে দিলেন। আমি বললাম,

—আপনারা পূজো দিন। আমি একটু বাইরে ঘুরে ফিরে দেখছি। দত্তবাবু বাধা দিয়ে বললেন,

—ক্যান, আপনি পূজা দেবেন না ? তয় আইছেন ক্যান ? আপনি কি রকম বামুন ? আমি হাসলাম। বললাম,

—আপনারাই তো দিচ্ছেন। ওতেই আমার হবে।

বৌদি বললেন,

—সেই ভাল ঠাকুর পো। আমরাই আপনার হয়ে পূজো দিচ্ছি।

—হঁ। সেই কর। আমরাই ওনার হইয়া পূজা দিয়া দিমু। এডা এট্টা কেমন কথা। তীর্থ স্থানে আইয়া পূজা না দিয়া যাওন যায়। আপনার গোত্তোর কি ?

আমি হেসে বললাম, 'সাবর্ণ'।

—আইচ্ছা আপনে যান। আমরা পূজা দিয়া পেরসাদ আর আশীর্বাদ লইয়া আইত্তাছি। বেশী দূরে যাইবেন না কিন্তু।

আমি এগিয়ে গেলাম পুলের দিকে। এই পুলকেই বলে লছমন ঝুলা। এই ঝুলা দেখতে আসে দূর দূরান্তর থেকে কত যাত্রী। ঝুলার এক পাড়ে ঋষিকেশ। অপর পাড়ে লছমন ঝুলা। দুদিকেই পাহাড়। মাঝখান থেকে বয়ে চলেছেন গঙ্গা। উভয় তীর কে যুক্ত করেছে এই পুল। সম্পূর্ণ ঝোলান। লোহার তারের টানায় উপর ঝুলে আছে। লম্বায় ৪৫০ ফুট। গঙ্গার উপর থেকে অনেক উচুঁতে। পাশে খুব বড় না হলেও টেক্সী জীপ একদিক থেকে যেতে পারে। গঠন আকৃতি অনেকটা হাওড়া ব্রীজকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও দুটির মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্য।

এই ঝুলা আকর্ষণ করে আমাকে বেশী। এর উপরে এসে দাঁড়ালে উভয় তীরের দৃশ্য নজরে পড়ে। এই ঝুলা থেকে সামান্য একটু দূরে গিয়েই গঙ্গা পাথরে আঘাত খেয়ে ছোট ঝর্ণার সৃষ্টি করেছে। যদিও ঋষিকেশ লছমন ঝুলায় পানীয় জলের সরবাহ ব্যবস্থা ভাল, তা হলেও এখনও বহু ঋষিকেশবাসী ঐ ঝর্ণার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। ঝুলার উপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে দেখা যায়, গঙ্গার স্রোত এখানে পাক খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝেই ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়দের মুখে শুনেছি এই সব ঘূর্ণনাকি অত্যন্ত বিপদ জনক। অবশ্য পরে সেটা আমিও উপলব্ধি করেছিলাম।

হরিদ্বার গঙ্গার মধ্য গতির প্রথম অবস্থা। ঋষিকেশ গঙ্গার প্রাথমিক গতির শেষ অবস্থা। লছমন ঝুলা যেতে বাঁয়ে তাকালে গঙ্গাকে বেশী দূর দেখা যাবে না। খানিক গিয়েপাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। এ যেন মহাদেবের জটার মধ্যে লুকোচুরি খেলা।।

গঙ্গার এই লুকোচুরি আরো ভালোভাবে দেখা যায় আরো উপরে উঠলে। ধরাসু, উত্তর কাশী, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি স্থানে যারা গেছেন তারা দেখতে পেয়েছেন বাল্যের গঙ্গা, কিশোরী গঙ্গাকে। দেখেছেন তার লুকোচুরি খেলা। সে ভারী অপূর্ব। আশা রাখছি অন্যত্র আলোচনা করবার।

কন্যা জন্ম নিয়েছে। কতটুকু বা ওর দেহ। সাধা ফুটফুটে মেয়ে। একটু বড় হয়েছে। মুক্তোর মত দাঁত বেরকরে খিল খিল করে হাসছে। বাল্যে পা দিয়েছে মেয়ে। বড় দুরন্ত। কখন হাসছে, কখন ছুটছে, কখন লুকোচ্ছে, কখনও বা নিজেই বেরিয়ে পড়ে হাসছে—খিল খিল করে। তোমরা আমায় দেখতে পাওনিতো? এই যে আমি।। ছুটতে গিয়ে কখনও পড়ে যাচ্ছে ও। আবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটছে। ব্যথা পেলেও হাসছে—সাদা চকচকে দাঁতগুলি বের করে। বাবা দেখছেন, মা দেখছেন, প্রতিবেশী দেখছে। দেখছি আমিও। ভারী ভাল লাগছে ওর এই খেলা।

কৈশরে পা দিল মেয়ে। ছুটছে, তবে বাল্যের মত নয়। খেলছে, তবে আগের মত সারা দিন নয়। হাসছে, আগের চেয়ে একটু কম। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেলে কাঁদছে না বটে, তবে একটু বিমর্ষ হয়ে, একটু সলজ্জ হাসি হেসে উঠে আবার চলছে। মা মাঝে মাঝে তিরস্কার করছেন। বাবা হাসছেন আর ভাবছেন। আমিও ভাবছি আর হাসছি কিশোরীকে দেখে।

এল যৌবন। ভরা যৌবন। মেয়ে আগের মত ছোটে না। আগের মত লুকোচুরি খেলেনা। আগের মত কারণে অকারণে খিল খিল করে হাসেনা। মাঝে মাঝে ভাবে। কি যেন ভাবে। ওর চলায় বলায় এসেছে ধৈর্য। এসেছে সংযম। দেহ এখন আর ছোট নেই। এখন বারবারন্ত। এ ভরা যৌবন নিয়ে কন্যা যখন চলে ধীর পদক্ষেপে, দু পাশের দাঁড়িয়ে থাকা স্তাবকেরা করে তার যশোগান। মায়ের তাড়া, বাপের চিন্তা। আমারো চিন্তা এ মেয়েকে কার হাতে সম্প্রদান করা যাবে? বর চাই, রূপে, গুনে, বিত্তায়, বড়। মেয়ের চেয়ে বড়। অবশেষে পাওয়া গেল বর। ঐ এগিয়ে এল সাগর। মিলিত হল গঙ্গাসাগরে। সাগরসঙ্গমে। ভোজের আসর বসেছে সেখানে। ভোজের আসর বসে প্রতি মাঘের শীতে—গঙ্গা মিলেছে যেথা সাগরসঙ্গমে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আপন মনে, গঙ্গাকে দেখে খেয়াল নেই। চমক ভাঙল একটি আট দশ বৎসরের ছেলের ডাকে। ছেলেটি আমার হাত ধরে বললে,

—কাকু, তোমায় আমার মা ডাকছেন।

আমি বিস্মিত হয়ে চারিদিকে তাকালাম। এখানে কে আমায় ডাকবে। বললাম,

—কোথায় তোমার মা?

—ঐ তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন দাদুর সাথে, চলনা?

আবার হাতধরে টান দিল ও। আমি কিছু বুঝতে না পেরে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে এগিয়ে চললাম।

একটু দূরে একটা চায়ের দোকানের সামনে, একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাত ধবে দাঁড়িয়ে আছেন আঠাশ উনত্রিশ বৎসরের একজন ভদ্রমহিলা। দেখে মনে হল, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বয়ষ ষাট পয়ষট্টির বেশী ছাড়া কম হবে না। মাথায় সব চুল ধবধবে সাদা। হাতে দামী লাঠি, চোখে পুরুকাচের চশমা, একটু সামনে ঝুঁকে পড়েছেন। ভদ্রমহিলাকে এক কথায় মোট মূটি সুন্দরী বলা চলে। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা কিনা দেখে বোঝা গেল না।

আমি হাত তুলে উভয়কে নমস্কার করলাম। দুজনেই প্রতি নমস্কার করলেন।

—আপনি আমায় ডেকেছেন? আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম,

—হ্যাঁ, আপনিই না লক্ষণ মন্দিরে দাঁড়িয়ে মন্দিরের বর্ণনা দিচ্ছিলেন? আমি বিনীত ভাবে বললাম,

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

ভদ্রমহিলা এবার একটু হেসে বললেন,

—আমার বাবার এবং আমার ছেলের আপনার গল্প ভাল লেগেছে। আমরা আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।

—আপনার ভাল লাগেনি?

ভদ্রমহিলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন আমার এই সরাসরি প্রশ্নে। একটু দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বললেন,—ও গল্প তো আমার জানা।

—সে তো বটেই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোধ করি বুঝতে পারলেন যে আমি একটু আহত হয়েছি। তাই তিনি বললেন,

—না, না বৌমা। একথা তুমি বলতে পারনা। তোমার জানা থাকলেও তুমিও কিন্তু মনযোগ দিয়ে শুনছিলে। এটা ঠিক, ভদ্রলোক বলেন সুন্দর।

ভদ্রমহিলা একটু লজ্জা পেলেন। তিনি একটু হেসে আমায় বললেন—আচ্ছা, যাদের কাছে বলছিলেন, তাদেরকে তো দেখছি না। তারা কোথায়? তাঁরা আপনার কে হন?

—দাদা, বৌদি। ওরা লক্ষ্মণ মন্দিরে পুজো দিতে গেছেন। ইনি বুঝি আপনার শ্বশুর?

—হ্যাঁ। ইনি আমার শ্বশুর মিষ্টার রায়, আর এই আমার ছেলে। আমি ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললাম,

—তোমার নাম কি খোকা?

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ

—আমার নাম দেবাশীষ রায়। মা, দাদা আমায় আশীষ বলে ডাকেন। বাবা ডাকতেন দেবু বলে। তোমার গল্প আমি শুনেছি কাকু, তুমি আবার বলবে?

—নিশ্চই বলব।

ছেলেটি তার বাবার কথা বলতেই ভদ্রমহিলার মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল দেখলাম। আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম,

—ওর বাবা আসেননি? তিনি কোথায়?

ভদ্রমহিলা চুপ করে রইলেন। রায় বাবু জড়িত গলায় বললেন,

—আমার ছেলে তিন বছর আগে মারা গেছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন বৃদ্ধ রায়বাবু নিজেই।

—চল বৌমা। ওনাকে নিয়ে এই চায়ের দোকানটায় বসে একটু চা খাই। ভদ্রমহিলা অনুমতি নেবার জন্যে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললাম,

—চলুন। চায়ে আমার কোন আপত্তি নেই।

চা-এর দোকানে ঢুকে তিন কাপ চা-এর অর্ডার দিলাম। আশীষ মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আব্দার শুরু করল।

—মা, আমিও চা খাব।

—ছোটদের অত চা খেতে নেই বাবা। এই তো সকালে দুধ খেলে বাবা, তুমি বরং গরম দুধ খাও।

আমি চা খেতে খেতে বৃদ্ধ রায়বাবুকে বললাম,

—আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

—আসানসোল থেকে। ওখানেই আমরা থাকি। ওখানকার কোলিয়ারীতে আমার একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনীয়ার ছিল। একটা বিরাট দুর্ঘটনা হয়। তাতে আমার ছেলে মারা যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রায় বাবুর বুক থেকে। আমি বললাম—আপনি কি করেন ?

—এই বয়সে আর কি করব। আমি আগে রেলে চাকরী করতাম। ভাল পদেই ছিলাম। রিটায়ার করার পরে মাসে মাসে পেনসন পাই। ছেলে মারা যাবার এক বৎসর পরে বৌমা একটা স্কুলে চাকরী নিল। অবশ্য আমার মত ছিল না। কারণ আমি যা পাই ওতেই আমাদের তিনজনের চলে যায়। কিন্তু বৌমা আমায় বলল, বাবা একটা কিছু না করলে আমি পাগল হয়ে যাব। তাই আর ওকে বাধা দেইনি। ও আমার লক্ষ্মী মেয়ে। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই এই বৃদ্ধ বয়সে এতবড় একটা শোক ভুলে গেছি।

রায় বাবু পকেট থেকে রুমালটা বের করে বারবার চশমাটা পরিষ্কার করতে লাগলেন। মনে ভাবলাম কত বড় আঘাত শেষ বয়সে পেয়েছেন। কি করে এখনও উনি দাঁড়িয়ে আছেন ? আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম,

—নিন আপনারা চা খান। চা জুড়িয়ে যাবে।

রায়বাবু চা-এর কাপে একটা বড় করে চুমুক দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন,

—বৌমা এবং আশীষের স্কুল ছুটি পরে গেল। বৌমা কিছুদিন ধরেই বলছিল, চলুন বাবা কোথাও ঘুরে আসি। মনে ভাবলাম কোথায় আর যাব। কোথায় গেলে আমার অরুর স্মৃতি ভুলে থাকতে পারব ? শুনেছি এই হরিদ্বারে মানুষ এলে নাকি সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনা ভুলে যায়।

তাকিয়ে দেখলাম, ভদ্রমহিলা এতক্ষণ উদাস নয়নে দূরে ঋষিকেশ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওঁর দু' চোখ দিয়ে অবিরত জলের ধারা বয়ে চলেছে। আশীষ একবার মা, একবার দাদু, একবার আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। আমি এই অবস্থায় কি করব, কি বলব কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

এদিকে দত্তবাবুর পুজো দেয়া হয়েগেছে অনেক্ষণ। পুজোর প্রসাদ এবং আশীর্বাদ নিয়ে আমায় খোঁজে এদিক ও দিক ঘুরেছে। অবশেষে এই চায়ের দোকানে আমায় দেখতে পেয়েই ছুটে এলেন।

—আপনে কি রকম লোক মশায় ? কইলাম কোথায় যাইবেন না। আর আপনে কিনা এই চা এর দোকানে বইয়া রইছেন ?

ঝড়ের গতিতে অনর্গল কথাগুলো বলে সামনে রায়বাবু এবং তার পুত্র বধুকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে থেমে গেলেন। গলার স্বর খানিকটা খাটো করে বললেন,

—কিছু হইছে নাকি ?

—না। আপনি বসুন। আসুন বৌদি। আপনারা চা খাবেন?

আমি দত্তবাবুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

—ইনি মিষ্টার রায়। আর ইনি তার পুত্রবধূ। ইনি মিষ্টার দত্ত আর উনি তার স্ত্রী।

দত্তবাবুর স্ত্রী এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বললেন,

—আমরা তখন থেকে আপনাকে খুঁজছি ঠাকুর পো, মনে করলাম আপনি বোধ হয় পালিয়েছেন। নিন প্রসাদ আর আশীর্বাদ নিন।

দত্তবাবুর স্ত্রী পূজোর প্রসাদ আর আশীর্বাদ সকলকে দিলেন। দত্তবাবু বললেন,

—বেলা অনেক হইছে। আমাগো তো এখনও থাকপার জাগা ঠিক হয় নাই। অবশ্য আমি আসফার আগে কালি কমলির ধর্মশালায় চিঠি দিছি।

রায়বাবু বললেন,

—আমরাও ওখানেই উঠেছি। গতকাল এসেছি। জায়গাটা বেশ ভাল লাগছে। ভাবছি কয়েকটা দিন থেকে যাবো এখানে। আপনারা উঠবেন ওখানে? তাহলে তো ভালই হয়।

আমি বললাম,

—ওখানে জায়গা আছে?

রায়বাবুই উত্তর দিলেন,

—শুনেছি তো আছে বলে। গিয়ে দেখতে পারেন।

দত্তবাবু রায়বাবু এবং আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

—আপনারা থামেন তো। জাগা পামুই। ছ্যাখেন, এই গুরুচরণ দত্ত হিসাব ছাড়া কথা কয় না। এইবার মশায় ওঠেন তো।

দত্তবাবু হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে ক্ষেপে গেলেন।

—আপনে মশায় মহা বাউণ্ডুলে তো?

দত্তবাবুর এই হঠাৎ অভিযোগে আমি বিস্মিত হলাম। আমি আবার কি অপরাধ করলাম? অবশ্য 'বাউণ্ডুলে' বিশেষণটি ইতিপূর্বে অনেকেই আমায় দিয়েছেন। ওতে আমি দুঃখ পাবার পরিবর্তে খুশীই হই বেশী। এমনিতো কোন পদবী পাইনি নেহাত পিতৃ দত্ত পদবী আর নিজের জোর করে ঢুকিয়ে দেয়া একটা 'শ্রী' ছাড়া। যদিও 'শ্রী' আমার কতটা আছে সে বিষয় আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং 'বাউণ্ডুলে' 'পাগোল' ইত্যাদি বিশেষণে খুশী না হয়ে পারি? অ এব একগাল হেসে বললাম,

—কেন, আমি আবার কি অপরাধ করলাম?

—বিছানা পত্তর কিছুই তো আনেন নাই বুঝি? রাত্রে শোবেন কিসে?

—এই কথা?

আমার সাইড ব্যাগটা দেখিয়ে বললাম,

—আপনার কোন চিন্তা নেই। এই যে ব্যাগটা দেখছেন, এতে সব পাবেন। দুটো চাদর আছে। একটা গায়ে দেব, আর একটা পেতে শোব। ব্যাস, আর কি চাই বলুন? শীত যখন নেই, তখন এতেই চলে যাবে।

রায়বাবু এবং তার পুত্রবধূর কাছে কিছুক্ষণ আগে দত্তবাবু এবং তার স্ত্রীকে নিজের দাদা বৌদি বলে পরিচয় দিয়েছি এবং তারা সেটা বিশ্বাস করেছেন বলেই আমার ধারণা। এবারে দত্তবাবুর কথা শুনে ওনারা উভয়েই বিস্ময়বোধ করতে লাগলেন আমি মনে মনে বেশ পুলকিত হয়ে উঠলাম। রায়বাবুর পুত্রবধূ দত্ত বৌদির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,

ইনি আলাদা বিছানা আনবেন কেন? আপনারা একত্রে আসেননি?

দত্তবাবুর স্ত্রীর পরিবর্তে দত্তবাবুই জবাব দিলেন,

—না, ওনার লগে তো আমার ট্রেনে পরিচয় হইছে। ক্যান্ উনি কি কিছু কইছে?

রায়বাবুর পুত্রবধূ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন,

—তাই নাকি? সে কথা তো আপনি বলেননি। আপনি যে বললেন ওনারা আপনার নিজের দাদা বৌদি?

একথার কি জবাব দেব। নিজের করে ভাবলে অপর আপন হয়। আর দূরের মনে করলে আপন পর হয়। সবই নির্ভর করে নিজের উপর। দত্তবাবু এবং দত্তবাবুর স্ত্রী বোধ করি ব্যাপারটা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই দত্তবাবুর স্ত্রী লজ্জিত হয়ে বললেন,

—ঠাকুরপো ঠিকই বলেছেন। খনি থেকে হীরে তোলা হয়। যে তোলে সেটা তার নিজের হয়।

রায়বাবু হেসে বললেন,

—তুমি একটু ভুল বললে বৌমা। খনি থেকে যারা হীরে তোলে তারা কিন্তু প্রকৃত হীরের মালিক হয় না। হীরের মালিক হন খনির মালিক। তিনিও আবার উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করে দেন। সুতরাং যিনি উপযুক্ত দাম দিতে পারেন তিনিই হন মালিক। তোমায় 'তুমি' বলে ফেললাম। তুমি কিছু মনে করো না বৌমা।

আগেই বলেছি, দত্তবাবুর স্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। রায়বাবুর কথার ইঙ্গিত ধরতে পেরে মনে মনে আহত হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না। তিনি হেসে বললেন,

—না না। আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আমার বাবার বয়সী। আমি কিছু মনে করিনি। আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম অঞ্জনা।

আমি অঞ্জনা বৌদিকে বললাম,

—এখন থেকে তাহলে আপনাকে অঞ্জনা বৌদি বলে ডাকব।

—বেশ, তাই ডাকবেন ঠাকুরপো।

—আপনার নামটা কিন্তু খুব সুন্দর। এ নাম কার ছিল জানেন তো?

—তাতো জানি না।

সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম,

—পবনের স্ত্রীর নাম অঞ্জনা। পবনের ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে জন্ম নেয় বীর হনুমান। হনুমান জন্মগ্রহণ করেই তাকিয়ে দেখে পূবের আকাশে জবাকুসুমের মত লাল হয়ে সূর্য্যদেব উঠছেন। অমনি মায়ের কোল ছেড়ে লাফ দিলেন আকাশে, সূর্যকে ধরবেন বলে। ভয়ে সূর্যদেব থর থর করে কাঁপতে শুরু করে দিলেন। তিনি স্মরণ নিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্র নিক্ষেপ করলেন হনুমানের দেহে। হনুমান অজ্ঞান হয়ে পাহাড়ের উপরে পড়ে গেলেন। পুত্রের এই দুর্দশা দেখে পিতা পবন দুঃখিত হয়ে নিজের কর্মভার ত্যাগ করলেন। পৃথিবী শুদ্ধ প্রাণীকুলের দম বন্ধ হয়ে মরে যাবার উপক্রম হল। নারায়ণ দেখলেন মহা বিপদ। তিনি পবনদেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলেন। হনুমানকে বাঁচিয়ে দিয়ে অমর বর দিলেন। আর বললেন, রাম অবতারে হনুমান হবেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। এই ভক্ত এবং তাপস শ্রেষ্ঠ হনুমানজীর মন্দির আপনারা দেখতে পাবেন লছমন ঝুলায়।

আমার বলা শেষ হতেই আশীষ আমার গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল,—আর একটা বল না কাকু।

আমি হেসে দিলাম। বললাম,—আবার পরে বলবো।

অঞ্জনা বৌদি রায়বাবুর পুত্রবধূর দিকে ফিরে বললেন,

—তোমার নামটা কিন্তু জানা হল না ভাই?

জবাবটা রায়বাবুই দিলেন।

—ও আমার জনম দুঃখিনী সীতা। ওর নাম সীতা।

তাকিয়ে দেখলাম সীতা বৌদির চোখ দুটো ছল ছল করছে। আমি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বললাম,

—সীতা জনম দুঃখিনী সেজেছিলেন লোকশিক্ষার জন্যে। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। আর যদি তিনি দুঃখকে বরণ করে না নিতেন, তবে হয়ত আজ জগতপূজ্যা হতেন না। লক্ষ্মণের স্ত্রী উর্মিলাকেও তো চৌদ্দ বৎসর স্বামী ছাড়া হয়ে থাকতে হয়েছে। কই কেউ

তো তাকে স্মরণ করে না। এমন কি অনেকে তার নামও জানে না। এই যে আপনারা লছমন ঝুলায় এসেছেন, এটা হল লক্ষ্মণের সাধনাস্থল। কোথাও লক্ষ্মণের পাশে উর্মিলাকে দেখতে পেয়েছেন? অথচ যেখানে রাম সেখানেই সীতা। সীতার জীবনের ট্রাজেডি নিয়ে রচিত হয়েছে রামায়ণ।

যে জীবন বাঁধাধরা পদ্ধতিতে চলে তা নিয়ে তো রচিত হয় না যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য। সাহিত্যে তিনিই স্থান পান, যে চরিত্রে রয়েছে সংঘাত, দ্বন্দ্ব। বিশ্বে যত কালোত্তীর্ণ কাব্য বা সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাদের মূলে রয়েছে নায়ক নায়িকার দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের সুষ্ঠু পরিবেশনা।

সীতা বৌদি বললেন,—তা হলে কি আপনি এই কথা বলতে চান যে, সীতা নিজেকে প্রচার করার জন্য স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন অত কষ্ট, অত দুঃখ? কোন নারী কি চায় স্বেচ্ছায় স্বামীহারা হয়ে থাকতে? আমার তো মনে হয় না।

আমি বললাম,

—তা হয়ত চায় না। তবে এটাও ঠিক, অনেকে চায় নিজেকে প্রচার করতে। চাইলেই তো সব কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। হওয়াও সম্ভব নয়। তার জন্যে মূল্য দিতে হয় অনেক। আর এই মূল্য অনেকেই দিতে চায় না বলেই জগতে সীতা চরিত্র সামান্যই জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা শুধু মেয়েদের বেলায় নয়। পুরুষদের বেলায়ও সমান ভাবে প্রযোজ্য। জীবনে প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা দিয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারা পেয়েছেন স্থায়ী আসন। আর যখনি তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, নড়ে উঠেছে আসন। উর্মিলা স্বেচ্ছানির্বাসন মেনে নেয়নি। আসেনি তার জীবনে সংঘাত। সীতা গ্রহণ করেছিলেন স্বেচ্ছানির্বাসন। তাই তার জীবনে এসেছিল সংঘাত। যাক, অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখন এ প্রসঙ্গ থাক। পরে আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ চলুন কালি কমলির ধরমশালায়। এখান থেকে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। ওদিকটায় কোন টাঙা বা রিক্সা নেই।

আমরা অন্য কোন মন্দিরে প্রবেশ না করে সোজা এগিয়ে চললাম কালি কমলি ধরমশালা অভিমুখে। কারণ দত্তবাবুর সাথে কিছু মালপত্র রয়েছে। ওগুলো নিয়ে চলতে দত্তবাবুর খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। ঝুলার কাছ থেকে একটা লোক নেয়া হল দত্তবাবুর বিছানা এবং সুটকেশ বইতে। কালিকমলিতে জায়গা পেলে সকলে মিলে রান্না করে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন দত্তবাবু এবং রায়বাবু। উভয় পরিবার উভয়কে পেয়ে বেশ খুসী হয়েছে মনে হল।

এদের কথাবার্তা শুনে মনে হল এরা কয়েক দিন অবস্থান করে মন এবং দেহের স্বাস্থ্য উদ্ধার করবেন। তা করুন, তাতে আমার কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। আর আপত্তি করলে শুনছে কে। আমারও অবশ্য পেছনে কোন তাড়া নেই। তবে ভয় হচ্ছে আমার একা ভ্রমণের কতটা স্বাধীনতা বজায় থাকবে। এ জায়গায় হাত পড়লে আমাকে পালাতে হবে।

এগারো

কালি কমলি দত্তবাবুর প্রেরিত চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিল। ফলে জায়গা পেতে আমাদের অসুবিধা হল না। হরিদ্বার থেকে যখন আসি তখন ভেবেছিলাম রাত্রেই আবার ফিরে যাব। অতএব ফেরা আর হল না।

আশীষ একটা সতরঞ্চি একটা কম্বল দুটো বেডশীট একটা এয়ার পিলো মাথায় করে নিয়ে এসে দুম্ করে ফেলে দিল।

—নাও কাকু এগুলো তোমার।

—আমার কোন দরকার নেই। এতসব আমায় দিলে তোমাদের অসুবিধে হবে।

—না না। আমাদের অসুবিধে হবে না কাকু। মা বলে দিয়েছেন।

—কোন দরকার নেই। এগুলো ফেরৎ নিয়ে যাও।

—আপনি যদি সানের উপরে শুয়ে রোগ বাধাবার সংকল্প করে থাকেন, তবে অবশ্য ফেরৎ দিতে পারেন।

চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সীতা বৌদি স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন, আর মুচকি মুচকি হাসছেন। আমি হেসে বললাম,

—না। সে রকম সংকল্প আপাততঃ আমার নেই। তবে ভবিষ্যতে এতটুকু স্নেহের পরশ পাবার লোভ দমন করবার মত সন্ন্যাসীও আমি নই।

—ভবিষ্যতের কথা পরে চিন্তা করলেও চলবে। বর্তমান নিয়ে ভাবুন।

—দেখুন, বর্তমান জলাঞ্জলি দিয়ে ভবিষ্যতের কথা কেউ ভাবে না। সেটা আমি জানি। তা হলেও কিন্তু মানুষ ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করে বেশী। আজ যখন আপনি ভাতের থালা নিয়ে খেতে বসে গেলেন, তখন কি আপনি ঐ থালার কথা চিন্তা করেন? না, পরের দিনের কথা চিন্তা করেন?

—দয়া করে এবার আপনার লেকচার থামাবেন? একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। নতুবা এই ধুলায় অসুখ অনিবার্য।

সীতা বৌদি কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে ঘরটা পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন। আমি স্বপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। মাথায় খোঁপাটাকে বেশ আঁট করে বেঁধে নিয়েছেন। কপাল এবং ঘাড় ঘেমে গেছে। কপালের উপর দু'চার গাছা চুল পড়ে ঘামে আটকে আছে।

—এই ধুলায় যদি আমার অসুখ অনিবার্য হয়, তবে আপনাকেও নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে না।

সীতা বৌদি এবার কৃত্রিম ধমক দিয়ে উঠলেন,

—সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। মেয়েদের অত চট্‌ পট্‌ অসুখ করে না।

আমি আশীষের হাত ধরে বাইরে চলে এলাম। একটু পরে সীতা বৌদি ঘর পরিষ্কার করে, আমার বিছানা পেতে দিলেন। আমি ঘরে ঢুকে বললাম,

—দত্তবাবু কোথায় গেছেন?

—বাজারে।

—অঞ্জনা বৌদি?

—দিদি রান্নার যোগাড় করছেন।

—বাঃ! এই সময়ের মধ্যে সংসার পাতা শুরু হয়ে গেল?

সীতা বৌদি কিছুটা গম্ভীর হয়ে, আমার চোখের দিকে একপলক তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন,

—কেন? আপনি কি সংসার পাতা পছন্দ করেন না?

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। মোটামুটি একটা হাল্কা কৈফিয়ৎ মনে মনে তৈরি করে নিলাম।

—আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি হলাম গিয়ে পথের মানুষ। শুনলেন না, দত্তবাবু চায়ের দোকানে আমাকে বাউণ্ডুলে বললেন?

সীতা বৌদি যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,

—বাউণ্ডুলে, পথের মানুষদের কিন্তু সংসারের আকর্ষণ বেশী থাকে।

বিছানায় গাটা এলিয়ে দিতেই শরীরটা ছেড়ে দিল। চিন্তা করছি কত কথা। চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই, আশীষের ডাকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আশীষ এবং সীতা বৌদি দাঁড়িয়ে।

—কাকু কখন থেকে তোমায় ডাকছি। ওঠ।

—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তাকিয়ে দেখি সীতা বৌদি স্নান সেরে এক পিঠ এলা চুল পিঠের উপর ছেড়ে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তার ধূমায়িত চায়ের কাপ, গরম লুচি আর আলু ভাজা।

সীতা বৌদি কৃত্রিম কোপে হাতের খাবার আর চা সশব্দে আমার সামনে নামিয়ে দিল। আমি একটু হাসলাম।

—বলি, বাউণ্ডুলে মশাইয়ের কি ক্ষিদেও পায় না?

—ওটা না পেলে কি রক্ষে আছে।

—আমার তো মনে হয় ক্ষিদে তেষ্টা আপনার নেই?

কোন উত্তর দেবার চেষ্টা না করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। সীতা বৌদি বোধ করি একটু লজ্জা পেলেন। ওর ফর্সা গাল দুটো ঈষৎ লাল হয়ে গেল। ধমক দিয়ে বললেন,

—দয়া করে খেয়ে আমায় ধন্য করুন। মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকলে খিদে মিটবে না।

আমিও লজ্জা পেলাম। চোখটা নামিয়ে নিলাম।

—খাচ্ছি।

—আপনি খেতে থাকুন। আমি ততক্ষণে আপনার জলটা নিয়ে আসছি।

সীতা বৌদি হাসতে হাসতে চলে গেলেন। আমি আশীষকে কাছে ডেকে বললাম,

—তুমি খেয়েছ আশীষ ?

—হ্যাঁ। আমি অনেকক্ষণ আগেই খেয়েছি। জেঠু বাজার থেকে সবার জন্যে আম এনেছে। তোমাকেও দেবে।

—জেঠু কাকে বলছ ?

—কেন ? ঐ যে তোমার সাথে যিনি এসেছেন।

মনে মনে ভাবলাম কতটুকু সময়ই বা, এর মধ্যে এক হয়ে গেছে কটি মানুষ। অথচ চার আঙুল জমি নিয়ে ঘটে রক্তপাত। ভাইয়ে ভাইয়ে হয় মন কষাকষি, পয়সা লোটে উকিল মোক্তারের দল। প্রবাসে, বিশেষ করে তীর্থে, মানুষ মানুষকে সহজেই কাছে টানে। এখানে থাকে না উঁচু নীচুর প্রভেদ। ধনী নির্ধনের পার্থক্য, উড়িয়া বাঙালী পাঞ্জাবীর ভেদাভেদ। সমস্ত মানুষ নিজের ঘরকে কেন মনে করে না তীর্থ ? তীর্থের মন নিয়ে কেন মানুষ মানুষের সাথে মেলে না ? আগেই বলেছি সব কেনর উত্তর মেলা ভার।

সীতা বৌদি ফিরে এলেন এক গ্লাস জল নিয়ে।

—একি, এখনও খাওয়া হয়নি যে ? চা জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে। ও দুটো আবার পড়ে রইল কেন ?

প্রচণ্ড শাসন, তদারকি শুরু হয়ে গেল সীতা বৌদির। দুনিয়ার নারী জাতির কি ঐ এক জায়গায় মিল রয়েছে ? পুরুষদের খাওয়াতে এদের এত তৃপ্তি কেন ? পুরুষের ক্ষুধাকাতর মুখ কি করে ওদের চোখে ধরা পড়ে ? এর জন্যেই বোধ হয় ওদের নাম জননী। ওরা সন্তানের ক্ষুধার্ত মুখ দেখতে দেখতেই ওদের আসন স্থায়ী করে নিয়েছেন। সামান্য ক্ষণ সময়ের পরিচয়। অথচ এরই মধ্যে অনুভব করছি প্রচণ্ড আকর্ষণ। এর জন্যেই কি ওঁরা মায়ার জাত ?

গঙ্গায় স্নান করবার জন্যে গামছাটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম একা একা। আপনি

মনে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে লছমন ঝুলার ঘাটে এসে দাড়িয়েছি নিজেই খেয়াল করিনি। গঙ্গার পারে বসে দেখছি তীর্থযাত্রীদের স্নান। আমি যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে ঘাট একটু দূরে। হঠাৎ ঘাট থেকে ভেসে এল বাঁচাও, বাঁচাও বলে কিছু অবাঙালী নারী পুরুষের আর্তচিৎকার। চমকে উঠে তাকালাম সেদিকে। দক্ষিণ ভারতীয় একটি পরিবার এসেছিল লছমন ঝুলায় তীর্থ করতে। ঘাটে তারা স্নান করছিল। স্বামী স্ত্রী এবং চৌদ্দ পনের বৎসরের একটি ছেলে। ঐ একটিই তাদের ছেলে। ছেলেটি সাঁতার জানে না। মা এবং ছেলে একই সাথে স্নান করছিল। ভদ্রলোক পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ মায়ের হাত ফসকে স্রোতের টানে ছুটে যায় ছেলে।

প্রথমে আমি চিৎকার শুনে হকচকিয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখি একটা মানুষ মাঝগঙ্গায় ডুব খেতে খেতে চলেছে। শুধু মাথা আর চুল ভেসে উঠছে আর ডুবে যাচ্ছে। মনে করলাম ওটা একটা কৌতুক। কিন্তু যখন সকলে মিলে চিৎকার করতে শুরু করল বাঁচাও বাঁচাও বলে—কোমরে গামছাটা পেচিয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। খানিকটা যেতেই কয়েকটি বাঙালী অবাঙালী মিলে ছুটে এসে আমায় গালাগালি দিতে শুরু করল। ছেলেটি তখন ডুবে গেছে। সুতরাং আর না গিয়ে ফিরে এলাম। পাড়ে এসে তাকিয়ে দেখি সীতা বৌদি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। চোখে ওর জলের ধারা। অবাক হয়ে গেলাম। সীতা বৌদি এখানে কিভাবে এল। আর উনি ওভাবে কাঁপছেন কেন? চোখে ওর জল কেন? তবে কি আশীষ? মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল।

ইতিমধ্যে অনেক লোক আমার চারধারে জড়ো হয়ে গেছে। সকলেই আমায় ভৎর্সনা করছে। কেন আমি ওভাবে ছুটে ঝাঁপিয়ে পডলাম। এখানকার গঙ্গার পাক নাকি ভয়ঙ্কর। ডুবন্ত মানুষকে তোলা তো দূরের কথা, ভাল সাঁতার জানা মানুষও নাকি বিপদে পড়ে যেতে পারে। এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়াটা নাকি আমার বোকামি হয়ে গেছে। আমি তাদের কথার উত্তর না দিয়ে সীতা বৌদির দিকে ফিরে প্রশ্ন করলাম,

—আপনি কাঁদছেন কেন?

সীতা বৌদি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন,

—আপনি কেন ওভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন?

—একজন মানুষ ডুবে যাচ্ছে, আর আমি তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করবো না?

সীতা বৌদি কোন উত্তর দিলেন না। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পারলাম না, পারলাম না ছেলেটিকে তুলে আনতে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটির মা বালির উপরে আছাড় খেয়ে কাঁদছে, বাবা বুক চাপড়াচ্ছে। ওদের মূল্যবান বস্তুটি লছমন ঝুলার গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে গেল। কি নিয়ে ওরা ঘরে ফিরবে? ওদের যে ঐ একটিই নয়নের মণি।

তাকিয়ে রইলাম গঙ্গার দিকে। কিছুক্ষণ আগেই ছিল আর রাক্ষসী মূর্তি। এখন আর গঙ্গার দিকে তাকালে বোঝা যায় না, ঐ গঙ্গাই একটু আগে মায়ের বুকের হারানিধিকে গ্রাস করেছে। এখন যেন কিছু জানে না। আগের মত কল কল, খল খল করে হেসে হেসে, নেচে নেচে, পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে। ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বিষণ্ন মন নিয়ে এগিয়ে চললাম ধরমশালার দিকে।

ভরত মন্দিরে দাঁড়িয়ে মন্দিরের মূর্তি দর্শন করছিলাম। সাথে অঞ্জনা বৌদি, সীতা বৌদি এবং আশীষ। রায়বাবু এবং দত্তবাবু এতটা পথ যাতায়াতের ভয়ে ধরমশালার বারান্দায় গল্প জুড়ে দিয়েছেন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা বৌদিকে প্রশ্ন করলাম,

—এখানেও কি আপনার পুজো দেবার ইচ্ছা আছে?

অঞ্জনা বৌদি একটু হেসে বললেন,

—কেন ঠাকুরপো, পুজো দিতে আপনার এত অনিহা কেন?

—পুজো দিতে আমার এতটুকু অনিহা নেই। আমার মতে পুজোর প্রধান উপকরণ হচ্ছে শুচীশুভ্র অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন। সেটা দর্শন এবং প্রণামের মধ্য দিয়েও হতে পারে। বাইরের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান কখনও কখনও অন্তরের শুভ্রতাকে বিনাশ করে। মনের অহং ভাব জাগ্রত করে। অশুচি করে অন্তরের অন্তরলোক। আমরা পুজো দিই কাকে? আমাদের সৃষ্ট, আমাদেরই গড়া ঠাকুরকে। আর এই ঠাকুর গড়ি আমাদের মনের মাধুরী এবং কল্পনায়। আমরা আমাদের যা কিছু ভাল, যা কিছু শুভ্র, যা কিছু সাধু তারই প্রতিচ্ছবি এই দেবতা। অর্থাৎ আমাকেই আমি করছি দেবতাজ্ঞানে পুজো। সেখানে যদি আঙ্গিক বড় হয়, দেবতার হয় কি প্রাণ প্রতিষ্ঠা?

সীতা বৌদি বাধা দিয়ে বললেন,

—আমি যদি বলি অন্তরকে শুচীশুভ্র করতে ঐ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান একটি সোপান!

—এ মতের আমি বিরোধী নই। তবে আগেই বলেছি, মনের সাধনার উপরেই নির্ভর করে সবটা। তাই সাধকরা সর্বাগ্রে সংযমের বাঁধনে বাঁধেন নিজেকে। নিজের মনকে।

—সকলেই তো আমরা সাধক নই। আর তাই যদি আমরা করি তবে তো এই ঋষিকেশ, হরিদ্বারে স্থান সংকুলান হবে না। বাজারে বেনারসী বিক্রি না হয়ে গেরুয়া কাপড়ের থান ব্লাক হবে।

এবারে আমি সীতা বৌদির বলার ধরণ দেখে হেসে ফেল্লাম। বললাম,

—না। সে ভয় নেই, মনকে তৈরি করতে কলকাতা ছেড়ে হিমালয়েও আসতে

হবে না, বা গেরুয়া কাপড়ও পরতে হবে না। ওটা বাড়িতে বসে সব কিছুর মধ্য দিয়েই চলতে পারে। ভগবান ওটুকু নিশ্চয়ই consider করবেন। কর্ম ছাড়া ধর্ম হয় না।

—মনকে বুভুক্ষু রাখার স্বার্থকতা আছে কি? মনই তো দেবতার মন্দির।

সীতা বৌদির কথায় চমকে উঠে তার চোখের দিকে তাকালাম। সেখানে মনে হল তারা দুটি জলছে।

—মনকে বুভুক্ষু রাখার কথা তো আমি বলিনি। তবে মন যা চায় তাই যে করতে হবে এমন কোন মানে নেই। ধরুন না, আজ অঞ্জনা বৌদির রান্নাটা এত ভাল হয়েছিল যে, মন বলছিল আরও খেতে। যদি আরো খেতাম দেহের অবস্থাটা কি দাঁড়াত?

আমার কথায় ওরা দুজনেই হাসতে লাগলেন। আমি আবার বলতে শুরু করলাম,

—আসল কথা কি জানেন? আগে দেহকে রক্ষা করতে হবে। তার পরে মনের ব্যাপার। ধরুন, দেহই থাকল না। তাহলে মন থাকবে কোথায়? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এগুলি তৃপ্ত না হলে দেহ থাকে না। কর্মের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেহকে বাঁচিয়ে রাখা। এর পরে আসে মনের ব্যাপার। অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বললে, বলতে হয়, আগে বস্তু তার পরে ভাব।

সীতা বৌদি বললেন,

—ওসব আলোচনা এখন থাক। তার চেয়ে ভরত মন্দিরের কথা বলুন।

—ভরত মন্দির সম্পর্কে আমি খুব বেশী কিছু জানি না। তবে শুনেছি ভরত নাকি এখানে এসে দীর্ঘদিন সাধনা করেছেন। তাই নাম অনুসারে হয়েছে ভরত মন্দির।

মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, ভরত এখানে তপস্যা করতে এসেছিলেন কেন? লক্ষ্মণ না হয় ব্রাহ্মণ বধ করে পাপ স্খালনের জন্য তপস্যা করতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু ভরত? তিনি তো কোন পাপ করেননি। একটি নির্মল চরিত্র, অথচ উপেক্ষিত। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয়। কিন্তু ভরতের ভ্রাতৃভক্তি অকল্পনীয়। এক কথায় বলা যায় বাল্মিকী প্রতিভার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ভাবলে অবাক হতে হয়। কত বড় ত্যাগ! কত বড় আদর্শ! হাতের মুঠোয় রাজ্যপাট, অপার ঐশ্বর্য, সুখ, সব কিছু পরিত্যাগ করে তপস্বীর বেশে রক্ষক। গৃহে থেকেও গৃহী নয়। রাজ্যলাভ করেও রাজা নয়, ঐশ্বর্য সুখ পেয়েও আনন্দিত নয়। বনবাসে না গিয়েও বনবসী। এ ত্যাগের তুলনা একমাত্র সাধকপ্রবর ভরতই হতে পারেন। প্রশ্ন জাগে, তার আবার সাধনার প্রয়োজন কোথায়? ভরত চরিত্র যতই ভাবি ততই মন করুণ রসে সিক্ত হয়। অবহেলিত ভরত। অবহেলিত মাণ্ডবী। ভরতের স্ত্রী মাণ্ডবী। কোথাও খুঁজে উঠেনি ভরত

মন্দির। একমাত্র এইখানে ছাড়া। অন্ততঃ আমার তো নজরে পড়েনি। মনের সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রণাম করি ত্যাগী শ্রেষ্ঠকে। কল্পনা করি, তার পাশে মাওবীকে।

রামায়ণ মহাভারতের দুটি ধারার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে এই ঋষিকেশ, হরিদ্বারে। হবে না কেন। কেবল মাত্র সিন্ধুর ধারাকেই আঁকড়ে ধরে সন্তুষ্ট থাকেনি আর্যরা। তারা আরো এগিয়ে এসে খুঁজে পেল গঙ্গার অমৃতধারা। ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে কেবল মাত্র উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রচেষ্টা নয়। এ অমৃতধারার সন্ধানে আর্যজাতি বেরিয়ে পড়েছিলেন সুখ ঐশ্বর্যে ভরা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে। যুগ হতে যুগে, কাল হতে কালে, মানুষের মধ্যে জেগেছে এ প্রবৃত্তি। তারই ফলস্বরূপ মহামানব সমাজে জন্ম নিয়েছেন—কলোম্বাস, ফা-হিয়েন, হিউ এন সাং, কাপ্তেন কুক, এডমণ্ড হিলারী, তেনজিং নোরকে প্রভৃতির দল। পথের দিশারীরা যুগে যুগে নিজের জীবনকে হাতের মুঠোয় পুরে, দিয়েছেন মহামানব জাতিকে নূতন পথের ঠিকানা। নূতন নূতন পথের ঠিকানার খোঁজ আজো চলছে। ভবিষ্যতেও চলবে।

ভরত মন্দির থেকে বেড়িয়েই সামনে বসার সিঁড়িতে বসে আপন মনে ভাবছি। ভাবনায় ছেদ পড়ল সীতা বৌদির কথায়। সীতা বৌদি হাত দুটি জোর করে আমার সামনে গম্ভীর হয়ে বললেন,

—হে সাধক প্রবর, আপনি যদি যখন তখন যেখানে সেখানে সাধনায় বসে যান, তবে তো আমাদের মত অবোলা নারীদের পক্ষে গৃহে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

সীতা বৌদি এমন ভাবে কথাগুলি বললেন যে আমি এবং অঞ্জনা বৌদি দুজনেই হেসে উঠলাম। সীতা বৌদিও হেসে ফেললেন। আমি হেসে বললাম— জানেন তো চোরের সাধক হবার গল্প?

আশীষ গল্পের নাম শুনেই পরম উৎসাহে আমার হাত ধরে ঝাকুনি দিয়ে বললে,

—বল না কাকু গল্পটা।

—এক চোর এক গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকল। গৃহস্থ টের পেয়ে চোরকে করল তাড়া। চোর প্রাণের দায়ে ছুটতে সুরু করল। এদিকে পাড়ার লোকেরাও জেগে উঠে 'ধর, ধর' বলে ছুটতে শুরু করল চোরের পেছন পেছন। চোর যখন দেখল আর তার উপায় নেই, ধরা পড়ে যাবে, তখন তার মাথায় এক ফন্দি এল। হঠাৎ সে একটা বটগাছের তলায় খানিকটা ছাই মেখে চোখ বুজে পড়ে রইল। এদিকে যারা তার পেছনে তাড়া করেছিল তারা এসে সাধু রূপি চোরকে প্রকৃত সাধু ভেবে পায়ের কাছে বসে তাকে প্রণাম করল। তাকে প্রণামী দিল, খাবার এনে দিল। চোর মনে মনে ভাবল আমি প্রকৃত সাধু হলে তো মানুষ আমার আরও শ্রদ্ধা করবে। সেদিন থেকে সে চুরি ছেড়ে প্রকৃত সাধু হল।

সীতা বৌদি আমার গল্পের কি অর্থ গ্রহণ করলেন জানি না। তিনি কিছুটা শ্লেষের স্বরে বললেন,

—চোরের সাধু হবার গল্প জানেন। সাধুর চোর হবার গল্প জানা নেই ?

—না, জানা নেই। তবে হয় বৈকি। মনে রইল। এরকম গল্প শুনলেই আপনাকে বলব।

অঞ্জনা বৌদি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগলেন। সীতা বৌদির আহত স্থানে খোঁচা দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। মনে মনে আমিও কিছুটা আহত হলাম। কতই বা বয়স, এই বয়সেই হারিয়েছেন স্বামীকে। ছোট আশীষের মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলে থাকতে হয়েছে অত বড় একটা শোক। পেরিয়ে এসেছেন যতটা, তার চাইতেও আরো অনেকটা চড়াই পড়ে রয়েছে ওর সামনে। সীতা বৌদি নারী। নারীর বড় অবলম্বন তার স্বামী। স্বামীহারা হয়ে সীতা বৌদি জীবনের চড়াইয়ের রাস্তায় একা। বড়ই একা। জানি না, অজানা ভবিষ্যৎ সীতা বৌদির হাত ধরে কোথায় পৌঁছে দেবে। তাকিয়ে দেখি সীতা বৌদি একটু ঘুরে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে আশীষের হাত ধরে বলাম,

—চলুন, এবার ফেরা যাক।

আমরা কিছুটা দূর এগিয়ে আসতেই নজরে পড়ল আমাদের আসার সময়ের সেই টাঙাওয়ালা যুবক একটি মেয়ের সাথে কথা বলছে। আমায় দেখতে পেয়েই হাত তুলে বলল,—নমস্তে বাবুজী।

—নমস্তে।

যুবকটি বলল তার ভাষায়,

—আপনারা কোথায় উঠেছেন ?

—কালি কমলিতে।

—কতদিন থাকবেন ?

—বলতে পারছি না।

—বাবুজী, তখন আপনাদের পুরো রাস্তাটা পৌঁছে দিতে পারিনি বলে রাগ করবেন না। আমার ঘোড়াটা পাগলা নয়। ওটা পক্ষীরাজের বাচ্চা। সকালে ওকে না খাইয়ে ভাড়া খাটানোর ফলে ও রেগে গিয়ে ঐ রকম করেছিল।

আমি হেসে ত.কে বললাম,

—না, রাগ করিনি। তবে অঞ্জনা বৌদি আর টাঙায় চড়বে না।

—মায়জীকে বাবুজী আপনি বুঝিয়ে বলুন। আমার ঘোড়া আর এমন করবে না। ফেরার সময় আমি পৌঁছে দেব। ভাড়া নেব না।

আমি হেসে অঞ্জনা বৌদিকে বাংলায় সব বলাতেই অঞ্জনা বৌদি আঁতকে উঠে মাথা নেড়ে বললেন,

—না না। আর আমি টাঙ্গায় উঠছি না। পায়ে হেঁটে যাবো সেও ভালো। বিশেষ করে ওর টাঙ্গায় তো নয়ই।

অঞ্জনা বৌদি যে ভাবে হাত পা নেড়ে, মাথা দুলিয়ে বলল তাতে রূপ সিং এর মুখটা মলিন হয়ে গেল। আমি রূপ সিংকে বললাম,

—ও মেয়েটি কে? তোমার স্ত্রী বুঝি?

—লছমীর কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমার স্ত্রী।

লছমী এতক্ষণ আমাদের কথা হা করে শুনছিল। এবার এগিয়ে এসে সীতা বৌদি এবং অঞ্জনা বৌদিকে দেখিয়ে ওর ভাষায় বললে,

—এরা দুজন আপনার কে হন?

—বৌদি।

লছমী প্রচণ্ড হাসে। যাকে বলে প্রাণ খোলা হাসি। অমন হাসি আমরাও হাসতে পারব না। চেহারাটা বেশ ভাল। ও যখন হাসে ওর সমস্ত অঙ্গ দুলতে থাকে। রূপ সিং যখন তার ঘোড়াকে পক্ষীরাজ বলে বর্ণনা দিচ্ছিল তখন লছমী মুখে কাপড় দিয়ে হাসছিল। আমি লছমীকে বললাম,

—লছমী তোমার রূপ সিং আজ তো আমাদের ওপারে পাঠিয়ে দিচ্ছিল।

—হাঁ বাবুজী। ও আমায় সব কথা বলেছে। ও বলেছে বাবুদের কাছ থেকে বেশী পয়সা নিয়েছ। যদি আবার দেখা পাই গাড়ী চাপিয়ে পুষিয়ে দেব।

—পুষিয়ে তো দেবে, কিন্তু তোমার ভাবী যে আর পক্ষীরাজ চাপতে রাজী নয়।

লছমী আবার হাসতে সুরু করল। রূপ সিং আমার দিকে তাকিয়ে করুণ নয়নে বলল,

—দেখলেন বাবুজী, ও এত বেশী হাসবে যে সময় সময় আমার রাগ ধরে যায়। এতে হাসবার কি আছে রে। ও আমার পক্ষীরাজকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। পক্ষীরাজের কথা বললেই ও হাসে। ওর হিংসায় আমার পক্ষীরাজ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাবুজী আপনি এই ঋষিকেশের সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, রূপ সিং আর তার পক্ষীরাজকে চেনেনা এমন মানুষ এতল্লাটে নেই। আমার পক্ষীরাজ পেটপুরে খেতে পেলে, সওয়ারী নিয়ে উড়ে চলে যাবে ঋষিকেশ থেকে হরিদ্বার।

রূপ সিংকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম,

—বুঝলাম, তোমার পক্ষীরাজের মত ঘোড়া এতল্লাটে আর নেই। কিন্তু লছমী, ওকে হিংসা করতে যাবে কেন?

লছমী এবারে বেশ রেগে গিয়ে বলল,

—ও কেন আমার চেয়ে পঙ্খীরাজকে বেশী ভালবাসবে? ও কেন ওকে এত যত্ন আদর করবে? জানেন বাবুজী, আমি খেতে পাই না পাই ওর সেদিকে নজর নেই, পঙ্খীরাজকে একবেলা একটু কম খেতে দিলেই গোসা হয়ে যাবে, কাঁদবে। পঙ্খীরাজ ওর জান বাবুজী। পঙ্খীরাজ ওর জান। আর আমি? আমি ওর হয়ে গতর খাটব, ঘোড়ার যত্ন নেব। ওর যত্ন নেব। আবার সোহাগ করব। বয়ে গেছে। পঙ্খীরাজ ওকে সোহাগ করুক। পঙ্খীরাজ না ছাই। পাগলা ঘোড়া কোথাকার। জানেন বাবুজী, ওকে মেলা থেকে দুগাছা চুড়ি কিনে দিতে বলেছি। ও সে টাকা দিয়ে পাগলাটার দানা কিনে নিয়ে এসেছে।

পঙ্খীরাজকে পাগলা ঘোড়া বললে রূপ সিং ক্ষেপে যায় বেশী।

—এই তুই আমার পঙ্খীরাজকে পাগলা বলবি না। তুই আমায় দুটো গাল দে। আমি কথাটি কইব না। কিন্তু তুই আমার ঘোড়াকে গাল দিলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

লছমী অধিকতর চেঁচিয়ে বলে,

—গাল দেব বেশ করব। তোর ঘোড়াকে আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব।

রূপ সিং এর মুখখানা কালো হয়ে যায়।

—দেখলেন বাবুজী দেখলেন? ও আমার পঙ্খীরাজকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। খাইয়ে দেখ বিষ। তাহলে তোকে ঐ গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারব।

দুজনের চিৎকারে আশপাশের লোক জড়ো হয়ে যায়। আমি দুজনকেই থামিয়ে দিতে চেষ্টা করি। ধমক দিয়ে বললাম,

—তোরা এত চিৎকার করছিস কেন? থাম, থাম বলছি।

—এই লছমী, চুপ কর বলছি।

এবারে রূপসিং এর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম,

—আমিও শুনেছি তোমার পঙ্খীরাজের মত ঘোড়া এ তল্লাটে নেই।

রূপ সিং খুব খুসী হল। মুহূর্ত মধ্যে ওর রাগ উবে গেল। বোকার মত হাসতে হাসতে বলল,

—হে, হে। বাবুজীও তা'হলে আমার পঙ্খীরাজের কথা শুনেছেন। তবে হ্যাঁ, বাবুজী, লছমী রেগে যায় বটে, কিন্তু ও সকলের চাইতে ভাল।

—হ্যাঁ তোমার জেনানা তোমার ঘোড়ার চাইতেও ভাল। তোমার ঘোড়াও তোমায় ভালবাসে, লছমীও তোমায় ভালবাসে।

—হ্যাঁ বাবুজী, লছমীর মত জেনানা হয় না।

লছমীর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখি ওর চোখে খুসীর ঝিলিক। আমি পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে রূপ সিং এর হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম—নে এটা দিয়ে ঐ দোকান থেকে লছমীর জন্যে চুড়ি কিনে দিস। আর ঘোড়া নিয়ে নিজের ঝগড়া করবি না। কেমন ?

রূপ সিং এবং লছমী দুজনেই বর্তে যায়। ওরা কত অল্পে খুসী। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, এই গারোয়ালী জাতটা যেমন সহজ সরল, তেমনি বিশ্বাসী। খাটতেও পারে খুব। আবার অল্পেতেই এরা সন্তুষ্ট। এক মুহূর্তে বিষ খাওয়াল, গলায় ডুবিয়ে মারল। আবার পর মুহূর্তেই দুজনে দুজনের হাত ধরে হাসতে হাসতে চলে গেল। অথচ অনেক ভদ্র শিক্ষিত ঘরে সামান্য কারণে অনেক অনর্থ ঘটতে দেখেছি। শিক্ষা মানুষকে করে বিনয়ী এবং মার্জিত। যারা তা নয় তাদের শিক্ষিত বলা যায় কি ?

খুসী মনে তাকিয়ে আছি রূপ সিং আর লছমীর গমনপথের দিকে। ওরা চলে গেল হাসতে হাসতে। অঞ্জনা বৌদি হিন্দী বা গারোয়ালী ভাষা মোটেই বোঝেন না। সীতা বৌদি একটু আধটুক বোঝেন। অঞ্জনা বৌদি বললেন,

—আপনি ওদের দুটো টাকা দিলেন কেন ?

—ওদের দুজনের খুসী হবার দৃশ্য দেখবো বলে।

অঞ্জনা বৌদি আমার কথা শুনে হা করে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। সীতা বৌদি একটু হেসে বললেন,

—কেন, খুসীর দৃশ্য কি আপনি দেখেন নি ?

—খুব কম। চলুন দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ভুবনজোড়া খুসীর চিত্র কোথায় আছে ? খুব সামান্য। বাইরে থেকে যেটা দেখি, তার অধিকাংশই বাহ্যিক। এ যেন অসুন্দর কন্যাকে জোর করে পেইন্ট করে সুন্দর সাজিয়ে বরপক্ষের সম্মতি আদায় করা। বাইরে থেকে দেখ, সুন্দর সাজান বাগান। চমৎকার বাড়ী, ভেতরে ঢোক সন্তর্পণে। কান পেতে থাক দেয়ালে। ওখানে শান্তির অন্তরালে চলছে অশান্তির চরম যন্ত্রণা। ঘরে ঘরে, দেশে দেশে, মানুষে মানুষে অশান্তির বিষের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোথায় যাবে তুমি ? পাতার কুটির থেকে শুরু করে ধনীর প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা—সর্বত্র ঢুকে পড়েছে এ বিষের ধোঁয়া। কোথায় পালাবে তুমি ? কোথায় গিয়ে নেবে তুমি নির্মল হাওয়ার নিশ্বাস ? ভাই ঠকছে ভাইয়ের হাতে। মা ঠকছেন পুত্রের হাতে। স্বামী ঠকছে স্ত্রীর হাতে। স্ত্রী ঠকছে স্বামীর হাতে। যে যেখানে পারছে ঠকিয়ে যাচ্ছে অপরকে। আবার সেও ঠকছে তার চাইতে অধিক বলশালীর হাতে।

কেরানী ঠকছে বড়বাবুর কাছে। বড়বাবু ঠকছে তার বড়বাবুর কাছে। চাষী ঠকছে মহাজনের কাছে। শ্রমিক ঠকছে মালিকের কাছে। বাংলা ঠকছে দিল্লীর কাছে। দিল্লী ঠকছে ওয়াশিংটনের কাছে। আইন ঠকছে পয়সার কাছে। দুর্বল ঠকছে সবলের কাছে। নিরীহ গোবেচারা ঠকছে পাড়ার মস্তানের কাছে। সকলেই ঠকছে, শুধু ঠকছে। সকলেই ঠকাচ্ছে, শুধু ঠকাচ্ছে। কোথায় পাবে তুমি খুসীর পরশ? চরম যন্ত্রণায় ধুকেছে মানুষ। ধুকছে মাতা বসুন্ধরা। ধুকুক। ধুকতে ধুকতে, মার খেতে খেতে, ফিরে আসবে চেতনা। ফিরে পাবে মানুষ নিজেকে। হয়ত তার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে এক গঙ্গা রক্ত। তাহলেও আসবে সেদিন। হয়ত সে দিন আমি থাকবো না।

ঋষিকেশের বুকে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একা আপন মনে বসে আছি গঙ্গার উপর বাঁধান একটি সিঁড়িতে। কালি কমলি থেকে সামান্য একটু দূর এই ঘাট। এখান থেকেই যাত্রীরা পারাপার হয় লছমন ঝুলা থেকে ঋষিকেশ, আবার ঋষিকেশ থেকে লছমন ঝুলা। লঞ্চে পঞ্চাশ পয়সা করে টিকেট। লঞ্চ না বলে বোট বললে ঠিক হয়। ইঞ্জিন বসান ছোট নৌকা। গঙ্গা এখানে কিছুটা চওড়া। ঋষিকেশের গঙ্গা পশ্চিম বাহিনী। অথচ হরিদ্বারে গঙ্গা দক্ষিণ বাহিনী। হরিদ্বার অপেক্ষা আমার মনে হল, ঋষিকেশের গঙ্গা বাঁক নিয়েছে ঘন ঘন। ফলে অনেক দূর পর্যন্ত গঙ্গাকে নজরে রাখা যায় না। এ যেন লুকোচুরি খেলা।

ওপার এপার দুই পারেই বিদ্যুতের আলো জলে উঠেছে। আমি যে জায়গায় বসে আছি, এখানটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আলোর খেলা দেখা যায় ভাল। গঙ্গার ওপারে পাহাড়ের রং সবুজের বদলে কালোরূপ ধারণ করেছে। ওপারে পাহাড়। এপারে পাহাড়। দু পারেই পাহাড়ের সারি। এ যেন মনে হয় দু পাশে দুই দৈত্য দাঁড়িয়ে ঋষিকেশ লছমন ঝুলাকে পাহারা দিচ্ছে। সারা দিন কিছুটা গরম পড়ার ফলে এখনকার এই ঝির ঝিরে হাওয়ায় দেহ হয়েছে শীতল। মন হচ্ছে স্বপ্নাবিষ্ট। সন্ধ্যায় ঋষিকেশের এই গঙ্গার শোভা অনবদ্য। একটু দূরে গীতা ভবন থেকে ভেসে আসছে বাতাসে গীতা ভবনের সান্ধ্য সঙ্গীত এবং মঙ্গল আরতির ঘণ্টা ধ্বনি। সুন্দরের দেবতা জেগে উঠেছেন ঋষিকেশের বুকে।

লছমন ঝুলার গীতাভবন এখানকার একটি আকর্ষণ স্থল। হরিদ্বারের গীতা-ভবন অপেক্ষা লছমন ঝুলার গীতাভবন অনেক বড়। ইংরাজী ইউ (U) অক্ষরের মত তিন দিকে ত্রিতল পাকা বাড়ী। সামনে মন্দির। বাড়ীটার নীচেরতলায় অনেকগুলি কক্ষ রয়েছে। বেশীর ভাগ কক্ষেই যাত্রীরা থাকেন। ইউ আকৃতির বাড়ীটার সামনে খোলা বারান্দা। বারান্দার দেয়ালে গীতার শ্লোক উৎকীর্ণ করা আছে। আর

আছে কৃষ্ণ লীলা এবং রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা বর্ণিত সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলী। সকাল সন্ধ্যায় গীতাভবনের গান আরতি এবং পাঠ শুনতে বহু যাত্রী সমাগম হয়। গীতাভবনের পরে ইউ. পি. সরকারের শো-রুম। এর পরেই বাজার। বাজারটিও বেশ সাজান। দামের দিক থেকে বলবো সস্তা নয়।

অঞ্জনা বৌদি, সীতা বৌদি, দত্তবাবু, রায়বাবু এবং আশীষ গেছে, গীতা ভবনে সন্ধ্যারতি দেখতে। আমি চলে এসেছি একা, এই গঙ্গার পাড়ে। আগেই বলেছি গঙ্গা আমায় আকর্ষণ করে বেশী। আমার যেন মনে হয় গঙ্গা ছাড়া ঋষিকেশ, হরিদ্বার শ্রীহীন। গঙ্গা বাড়িয়েছে ঋষিকেশ, হরিদ্বারের গৌরব। তীর্থ শ্রেষ্ঠ ঋষিকেশ, হরিদ্বার চিরদিন গঙ্গার কাছে ঋণী। কলনাদিনী অপরূপা গঙ্গা হরিদ্বার, ঋষিকেশের প্রাণস্বরূপা।

কখন থেকে সীতা বৌদি পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন টের পাইনি। চমকে উঠলাম সীতা বৌদির কথায়,

—গীতা ভবনে সন্ধ্যারতি দেখতে গেলেন না কেন?

ম্লান হেসে আমি জবাব দিলাম,

—এমনি। মানুষের ভীড় থেকে নির্জনতাই বেশী ভাল লাগে আমার।

সীতা বৌদি চুপ করে রইলেন কিছুটা সময়। আমি বললাম,

—ওরা চলে এসেছেন?

—না, ওঁরা ওখানেই আছেন।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে সীতা বৌদির মুখের দিকে তাকালাম। সীতা বৌদি ভেতর থেকে উঠে আসা একটা দীর্ঘশ্বাস সযত্নে চেপে একটু হেসে বললেন,

—ওখানে আপনাকে দেখতে না পেয়ে চলে এলাম আপনাকে খুঁজতে। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব? অবশ্য যদি মনে কিছু না করেন?

—বলুন।

—আপনি কি আপনার কোন গোপন ব্যথা চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন?

আমি একটু হাসলাম,

—কেন, আমায় দেখে কি সেই রকম মনে হচ্ছে? তবে আপনার চেয়ে বেশী নয় নিশ্চয়ই?

—যদি বেশী নাই হবে, তবে ভরত মন্দিরে বসে ওভাবে আমায় আঘাত দিলেন কেন? এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে আপনাকে আমি যতটুকু চিনতে পেরেছি, আপনি তো সে ধরণের মানুষ নন।

—সে জন্যে আপনি আমায় মাপ করবেন। ওটা আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়।

আমি যখন বুঝতে পারলাম আপনি ব্যথা পেয়েছেন, আমি মনে মনে অনুতপ্ত হলাম। ভেবে ছিলাম সময় পেলে আপনার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব।

—ক্ষমা চেয়ে আপনি আমায় অপরাধী করবেন না। আপনাকে আমি চিনি। আমি থমথমে আবহাওয়াটাকে হাল্কা করার জন্ম হেসে বললাম,

এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন? স্বয়ং ভগবান মানুষকে আজো চিনতে পারেন নি। মানুষ সৃষ্টি করে ভগবান ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছেন। মানুষের ক্ষণভঙ্গুর চরিত্র দেখে অনেক চেষ্টা চরিত্র করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন তিনি। তাই মানুষ যা খুসী করছে। ভগবানও যা খুসী করছেন। মানুষ যা চাইছে ভগবান তার উল্টোটা করে দিচ্ছেন। আবার ভগবান যা চাইছেন মানুষ তার উল্টোটা করে বসে থাকছে।

সীতা বৌদি মুখে একটুখানিক হাসলেও তার অন্তরভেঁদী দৃষ্টি আমায় অস্থিরতায় ফেলে দিল। আমি বললাম,

—আপনি এভাবে একা চলে এসেছেন দেখে কেউ যদি কিছু মনে করে?

—যদি নয়। অঞ্জনাদি তো এর মধ্যেই মনে করতে শুরু করেছেন।

আমি চমকে উঠে সীতা বৌদিকে প্রশ্ন করলাম,

—কি করে বুঝলেন?

মেয়েরা যদি মেয়েদের কথা না বুঝতে পারবে, তবে বুঝবে কে? অনেক কিছুই ফাঁকি দেয়া যায়। কিন্তু মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেয়া যায় না।

—তবে এখানে একা এলেন কেন?

—আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। তাছাড়া এর জন্তে দায়ী আপনিই বেশী।

—কি রকম?

—আপনার মনকেই আপনি প্রশ্ন করুন।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম।

—না না। আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে চাই না। আমায় আপনি বিশ্বাস করুন। আমি চাই আপনি সুখী হন। আমি পথের মানুষ। পথই আমার ঠিকানা। আমি কেন যাব চাঁদে হাত বাড়াতে? আমায় আপনি ক্ষমা করুন। আমি আজই চলে যাব।

সীতা বৌদি আমার হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। ওঁর হাতের পরশে আমার শিরা উপশিরায় বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সীতা বৌদি দৃঢ় স্বরে আমায় বললেন,

—পাগলামো করবেন না। আমি আপনায় চিনি। আপনার দ্বারা আমার কোন অপকার হওয়া সম্ভব নয়। সেটা আমি জানি। যে লোক গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে নিজের

জীবন বিপন্ন করতে পারে। সামান্যা একজন নারীর সন্দেহে এত ভয় তার? তাছাড়া এভাবে চলে গেলে আমায় একটা লজ্জায় ফেলে দেয়া হবে। আপনি কি সেটা চান? আপনি চলে গেলে আমার ব্যথা বাড়বে বই কমবে না। ঋষিকেশ থেকে পালাতে পারবেন। কিন্তু মন থেকে পালাতে পারবেন না।

হতাশ হয়ে বসে পড়লাম মাথা নীচু করে। কোন মতেই সীতা বৌদির মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। হায় ঈশ্বর! এ আবার তোমার কোন খেলা? সীতা বৌদি সম্পর্কে আমার মনে এতটুকু দুর্বলতা নেই। হতে পারে সীতা বৌদি সুন্দরী। প্রস্ফুটিত কুসুম। কুসুমের সৌন্দর্য তো আমি দূর থেকে উপভোগ করতে চেয়েছি। বৃন্তচ্যুত তো করতে চাইনি। সুন্দরকে দেখা কি অপরাধ? আমার অবচেতন মন একটুখানিক হাসল। উপরে তাকিয়ে দেখি নীল আকাশে অসংখ্য তারার দল ঝিক্ মিক্ করে হাসছে। মনে হল, সীতা বৌদিও জয়ের আনন্দে হাসছে। শুধু আমার পরাজিত মন খোঁচা খেয়ে-খেয়ে কাঁদছে। গীতা ভবনের আরতির ঘণ্টা আর কানে আসছে না। বসে আছি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে।

পরের দিন আশীষের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি অনেক বেলা হয়ে গেছে। চারিদিকে সোনালী রোদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

—কাকু ওঠ। চা খাবে না? অনেক বেলা হয়ে গেছে। বেড়াতে যাবে না?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি পৌনে আটটা বাজে। ওখানে পৌনে আটটা মানে অনেক বেলা। চোখে তখনও প্রচণ্ড ঘুম। সারারাত মাথার যন্ত্রণায় বিছানায় ছট্‌ফট করেছি। শেষ রাতের দিকে ঘুমটা এসেছিল বোধ করি। আশীষের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, সীতা বৌদি অঞ্জনা বৌদি এবং দত্তবাবু গঙ্গায় স্নান করতে গেছেন। রায়বাবু এবং আশীষ রয়েছে। আমি আশীষকে বললাম,

—তা হলে আমাদের চা করে দেবে কে?

—কেন, মা তো চা করে তোমার আর দাদুর জন্যে ফ্লাস্কে করে ঢেলে রেখে গেছে। আমাকে বলেছে তোমরা দুজনে ঘুম থেকে উঠলে চা বিস্কুট দিতে। গঙ্গা থেকে এসে খাবার বানাবে মা।

—তোমার দাদুও কি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন?

—দাদুর তো রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। তাই রোজ উঠতে দেরী হয়ে যায়। আমি তো দাদুর সাথে চা খাই।

আমি হেসে বললাম,

—কেন? তুমিও কি দাদুর মত উঠতে দেরী কর নাকি?

—না। আমায় তো মা চা খেতে দেয় না। তাই দাদু যখন খায় আমার

লুকিয়ে লুকিয়ে দেয় প্লেটে ঢেলে। মা বলে বাচ্চাদের চা খেতে নেই। আমি রোজ গরম দুধ খাই।

আশীষ একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে,

—জান কাকু, কাল রাতে মাও ঘুমোয়নি।

আমি সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলাম,

—কেন ?

—কি জানি। ভীষণ গরম লাগছে বলে বাইরে গিয়ে বসেছিল।

জানি সীতা বৌদির মনে ঝড় উঠেছে। সেটা সে যতই আড়াল করে রাখুক না কেন। যখনি সবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, নিষ্ঠুর বিধাতা চরম আঘাতে ভেঙে দিয়েছেন সে স্বপ্ন। একটা জীবন শুধু ব্যর্থতার বোঝা বয়ে বেড়াবে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এল বুক থেকে।

—তুমি একটুখানিক বস। আমি বাথরুম থেকে আসি।

—তুমি তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু কাকু।

—আচ্ছা।

আমি বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি, রায়বাবু চা ঢেলে আমার জন্তে বসে আছেন। আমি কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললাম,

—আপনি কেন আবার ওসব করতে গেলেন। আমি নিজেই তো ঢেলে নিতে পারতাম।

রায়বাবু হেসে বললেন,

—তাতে কি হয়েছে। আমার আবার একটি লেজ রয়েছে, দেখছেন না ? এনাকে রোজ প্রসাদ না দিলে আমার রক্ষা আছে।

আমি বুঝলাম, লেজ মানে আশীষ। আমি আশীষের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম। আশীষ কিন্তু মুখখানা গোমরা করে বসে আছে। আমি বললাম,

—কি, তুমি মুখখানা অমন গোমরা করে বসে আছ কেন ?

রায়বাবু উত্তর দিলেন,

—করবেন না। ওনাকে ওনার মা আমাদের চা পরিবেশনের দায়ীত্ব দিয়ে গেছেন। সেটা আমিই করে ফেলেছি বলে উনি অপমান বোধ করছেন।

আমি বিষয়টা বুঝে নিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলাম। আমার হাসিতে বোধ করি ওর অপমানটা আরো বৃদ্ধি পেল। উঠে দরজার আড়ালে গিয়ে মাথা দুলিয়ে হাত-পা নেড়ে, চোখের ইসারায় তার দাদুকে কি যেন দেখাতে লাগল। রায়বাবু আমায় চোখের ইসারা করে আশীষকে দেখিয়ে বললেন,

—কি বলছে বুঝতে পারছেন ?

আমি সে দিকে তাকাতেই আশীষ সরে গেল। আমি বললাম,

—বুঝলাম না তো ?

রায়বাবু হেসে বললেন,

—বুঝলেন না ? ডাক্তার আমায় সিগারেট খেতে নিষেধ করেছেন। তাই মাঝে মধ্যে দু একটা লুকিয়ে চুরিয়ে খাই। বৌমা দেখতে পেলে খুব রাগারাগি করে। আজ সকালে ওরা গেছে গঙ্গায় স্নান করতে। তাই সুযোগ বুঝে একটা সিগারেট খেয়েছি। আমার লেজুর মশাই তাই দেখতে পেয়েছেন। এবারে উনি রেগে গেছেন। ("মা এলেই তুমি আবার সিগারেট খেয়েছ, বলে দেব") এই আর কি।

আমি আবার হাসতে লাগলাম,

আমি আর রায়বাবু বসে গল্প করছি। এমন সময় দত্তবাবু বাজারের একটা ব্যাগ হাতে করে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বললেন,

—এই যে, দুই জনেরই ঘুম ভাঙছে এতুক্ষণে। আর আমার তো এদিকে বাজারও হইয়া গেল। এখোন কন, আমাগো আইজকের প্রোগ্রাম কি ? আমি কিন্তু কোথাও যামু না। গঙ্গা আর গীতা ভবন। গীতাভবন আর গঙ্গা। এই দুই জায়গায় আমার খুব ভাল লাগে। আমারে আর টানাটানি কইরেন না। অরা আয় নাই এতুক্ষণে ? ওইতো আইছে। তোমাগো আওয়ার মধ্যেই আমার বাজার হইয়া গেছে।

তাকিয়ে দেখি সীতা বৌদি এবং অঞ্জনা বৌদি গঙ্গা স্নান সেরে ফিরছেন। অঞ্জনা বৌদি আমার দিকে ফিরে বললেন,

—এ বেলায় কি কোথাও যাবেন ঠাকুর পো ?

আমি একটা হাই তুলে বললাম,

—এ বেলায় আর বেড়ানো ভাল লাগছে না।

দত্তবাবু আমায় সমর্থন করে বললেন,

—হ। এ বেলা আর বাইরইয়া কাম নাই।

তপোবন। ঋষিকেশের তপোবন। তপোবন ঋষিকেশে নয়, লছমন ঝুলায়। ঝুলার পুল পেরিয়ে একটু এগিয়ে এলেই শুরু হল তপোবন। শেষ হল কালি কমলির ধরমশালার কাছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই তপোবন। উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে লছমন ঝুলার পাহাড়, মাঝখানে আম্রকুঞ্জে তপোবন। তপোবনকে দু'পাশে রেখে মাঝ বরাবর সোজা ঝুলা থেকে বাজার অবধি চলে গেছে পিচঢালা রাস্তা। আম্রকুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় সাধু সন্ন্যাসীদের সাধনার আবাসস্থল। দীর্ঘকাল ধরে সাধকরা এখানে সাধনা করছেন। তীর্থযাত্রীদের ভীড় এখানে অনেকটা কম। পাহাড়ের সামান্য

কিছুটা উঁচুতে কয়েকটা মন্দির রয়েছে দেখতে পেলাম। সেখানে আর যাওয়া হল না। শুনেছি, এখানকার সাধু সন্ন্যাসীদের সিধা আসে কালি কমলির ধরমশালা থেকে।

ফেরার পথে নজরে পড়ল একজন প্রায় উলঙ্গ সাধক কাঁটার উপরে শুয়ে রয়েছেন রাস্তার ধারে। সাধকের চেহারা বলতে দেহের কিছু হাড়ের সমষ্টি। আমার মোটেই ভাল লাগল না। সাধকের সাধনা তো মানুষ দেখানোর জন্যে নয়। ওটা তো হচ্ছে লোক-দেখানোর জন্যে। আর যদি তাই হবে, তবে তো সার্কাসের লোকেরা আরো বড় সাধক। তপোবন থেকে সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরে এলাম।

গতকাল গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে আসার পর থেকে সীতা বৌদি আমার সাথে কোন রকম কথা বলার চেষ্টা করেননি। আমিও সযত্নে তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছি। আমায় তিনি খেতে দিলেন। আমার বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করে পেতে দিলেন। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা বার বার এসে দেখে গেলেন।

আজো তপোবন থেকে ফিরে গঙ্গার ঘাটের সেই নিরালা কোণটিতে বসে রইলাম চুপ করে। বারে বারে ফিরে তাকাচ্ছি সীতা বৌদি আসে কিনা। না, তিনি এলেন না। আসুক তিনি, এটাও আমি চাইনি। সীতা বৌদি হারিয়ে যাক আমার স্মৃতি থেকে। ওটা একটা দুর্বল মুহূর্তের স্বপ্ন। স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক এটা আমি চাইনি। সীতা বৌদি স্বপ্ন। বাস্তব নয়। অঞ্জনা বৌদি, দত্তবাবু, রায়বাবু, আশীষ, সীতা বৌদিরা মিশে যাবে জনারণ্যে। আমি ভেসে যাব অজানার স্রোতে। সেই তো ভাল। নিয়ে যাব শুধু স্মৃতি।

বেড়াতে বেরোবার সময় ইচ্ছে করেই আমার ব্যাগটা সাথে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সীতা বৌদি কিন্তু নজর করেছিলেন সেটা। মুখে কিছু বলেননি। গঙ্গার দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে উঠে পড়লাম। বিদায় ঋষিকেশের স্নেহময়ী গঙ্গা। বিদায় ঋষিকেশ। বিদায় লছমন ঝুলা। কবে আসবো জানি না। তবে আবার আসবো তোমাদের কাছে। তোমাদের আকর্ষণ ছিন্ন করার মত শক্তি আমার নেই। তোমরা আমায় ভুলে গেলেও তোমাদের আমি ভুলবো না কোনদিনও। চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছে। মাথাটা হয়ে উঠেছে ভারী। ঘাট থেকে লঞ্চে উঠতে যাব এমন সময় তাকিয়ে দেখি সীতা বৌদি দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে। চোখে ওর জলের ধারা।

—আমায় না হয় নাই বা বললে। ওদের তো তোমার যাবার আগে বলা উচিত ছিল। আমি জানতাম, তুমি থাকবে না। তোমাকে ধরে রাখার মত শক্তিও আমার নেই। তাই সে চেষ্টা আমি করছি না।

—ওঁদের বললে ওঁরা যেতে দিত না। আমায় তুমি বাধা দিও না।

—না। বাধা আমি দেব না। আর বাধা দিলেও তুমি মানবে না জানি। আমায় তো তুমি কিছু বললেও না।

শেষের কথাগুলি বলতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ও।

—দাঁড়াও শেষবারের মত একটা প্রণাম করি।

আশীষের জন্যে রাস্তা থেকে একটা খেলনা কিনে এনেছিলাম। ব্যাগ থেকে সেটা বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম,

—এটা আশীষকে দিও। মানুষের আশীর্বাদের যদি কোন ফল থাকে তবে সেই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে তোমায় বলছি আশীষকে নিয়ে তুমি সুখী হও। আমার ক্ষণিকের স্মৃতি যেন তোমার মনকে বিচলিত না করে।

—এখন তুমি কোথায় যাবে ?

—জানি না।

—সাবধানে থেকো।

আর বলতে পারেনি ও। আমার গলাটা ধরে এল।

—তুমিও সাবধানে থেক। আর কারো জন্যে না থেকো অন্ততঃ আশীষের জন্যে থেকো।

লঞ্চে গিয়ে উঠলাম। লঞ্চ চলতে শুরু করল। লছমন ঝুলা থেকে হৃষিকেশ। কিছুটা দূরে যেতেই ফিরে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকারে আমি যেখানে বসতাম, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ও একা। চোখটা ঝাপসা হয়ে এল আর দেখতে পেলাম না।

॥ বারো ॥

লক্ষ লছমন ঝুলার ঘাট ছেড়ে ঋষিকেশের ঘাটে এসে দাঁড়াল। ঋষিকেশের গঙ্গার ঘাট বাস রাস্তা থেকে অনেকটা ঢাল হয়ে নেমে এসেছে। বাঁধান সিঁড়ির ধাপ বেয়ে কিছুটা উপরে উঠে সরু গলির মত রাস্তা উপরে উঠে গিয়ে বড় রাস্তার সাথে মিশেছে।

আমি জানতাম ঘাট থেকে রাস্তায় উঠলেই রূপ সিং তার টাঙা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেইমত আজ সকালে তাকে বলে দিয়েছিলাম।

সকালে গঙ্গায় স্নান করতে যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়। তখন ঝুলার কাছে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। রূপ সিং সওয়ারী নিয়ে এসেছিল স্টেশন থেকে লছমন ঝুলায়। গাড়ী রেখে আসছিল আমার সাথে দেখা করবার জন্যে তখন ওকে বলেছিলাম গাড়ী লক্ষঘাটের কাছে রাখতে।

—সকলেই যাবেন তো বাবুজী?

—না। আমি একা যাব।

রূপ সিং বিস্মিত হয়েছিল,

—আপনি একা কেন যাবেন বাবুজী?

—আমার খুসী।

—রাত্রে কোথায় যাবেন?

—এবারে আমি রেগে গিয়ে ওকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম,

—তোর যেখানে খুশী আমায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিস। তোর অত ভাবতে হবে না।

ও আরো অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল হা করে। কি বুঝেছিল জানি না। ও হয়ত ভেবেছিল আমি রাগ করে চলে যাচ্ছি। মুখে বলেছিল,

—জী বাবুজী। আমি সন্ধ্যার সময় গাড়ী নিয়ে ঘাটের কাছে থাকবো।

ঘাট থেকে উপরে উঠে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি রূপ সিং আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমায় দেখেই ছুটে এল। আমি বললাম,

—রূপ তোর গাড়ী কোথায়?

রূপ হাতের ইসারা করে দেখিয়ে দিল। আমি গাড়ীর কাছে এগিয়ে যেতেই দেখি সামনের সীটে লছমী বসে মুচকি মুচকি হাসছে আমায় দেখে।

আমি বললাম,

—তুই এখানে কেন?

লছমী হাসতে হাসতে জবাব দিল,

—কেন, আমি যাব না?

—কোথায়?

—তুমি যেখানে যাবে বাবুজী।

আমি রেগে গিয়ে বললাম,

—আমি যাব গোল্লায়। তুই যাবি আমার সাথে?

লছমী খিল খিল করে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। ও যখন হাসে ভারী ভাল লাগে। এ যেন একটি শিশু।

—হ্যাঁ। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

এবারে হাসি থামিয়ে বললে,

—তুমি না ওকে বলেছ বাবুজী, যেখানে নিয়ে যাবে তুমি সেখানে যাবে। চল, ওঠ গাড়ীতে।

আমি মনে মনে ভাবলাম রূপ নিশ্চয়ই সকালের সব কথা লছমীকে বলে দিয়েছে। আমি আর কোন কথা না বলে গাড়ীতে উঠে বসলাম। রূপ গাড়ী ছেড়ে দিল হাসতে হাসতে।

গাড়ী গড়িয়ে নীচের দিকে নামছে। আমি অবসন্ন মনে গাড়ীতে ঠেস দিয়ে বসে আছি। আমার পাশে লছমী। মনে আসছে অনেক কথা। ঝড়ে বিধ্বস্ত শান্ত রায়বাবু, সহজ সরল দত্তবাবু, শান্ত স্নিগ্ধ অঞ্জনা বৌদি, ছোট আশীষ। সব কিছু ছাপিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে-পরা সীতা বৌদির মুখখানা ভেসে উঠছে বারে বারে। মনে ভাবলাম, এখনও কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে ও। হয়ত কাঁদছে। কতটুকু পেল ও জীবনে। পেতে গিয়েই শূন্য হয়ে গেল। একটা ব্যর্থ জীবন। অঞ্জলি হারিয়ে পেয়েছিল। সীতা বৌদি পেয়ে হারাল। ব্যথায় মনটা টন টন করে উঠে।

হে হৃষিকেশ! তোমার স্থানের মাহাত্ম্য যদি কিছু থাকে, তবে ভুলিয়ে দাও। ভুলিয়ে দাও আমায় সব। অজানার ডাকে বেরিয়ে পড়েছিলাম পথে। পথ আমায় ডাকে। পথের আনন্দে মেতে থাকি আমি। কিন্তু একি! পথের মাঝে যে দুঃখ সুখের এত নুড়ি পড়ে আছে জানতাম না। কত কুড়াবো। যেটা দেখি সেটাই তো নূতন। আর তুলবো কোথায়?

পথ চলতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। পথ ক্ষমা করেনি আমায়। দণ্ড দিয়েছে সাথে সাথে। নির্মম দণ্ড। হোচোট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম পাথরের উপর। প্রচণ্ড আঘাতে সর্ব অঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। লছমী তাকিয়ে আছে আমার দিকে করুণ নয়নে। ওরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যাক, যেখানে খুশী নিয়ে যাক আমায়। আমি চাই পালাতে, এই মুহূর্তে অনেক অনেক দূরে। যেখান থেকে সীতা বৌদির সাথে আর দেখা হবে না। দেখা হবে না কোনদিনও। আমি ভীরু। মনে পড়ে সীতা বৌদির কথা। ঋষিকেশ থেকে পালান যায়, কিন্তু মন থেকে পালান যায় না। আমি উদ্ধশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছি। আমার পালান দেখে মন হাসছে মুচকি মুচকি। বাইরে তাকিয়ে দেখি টাঙা ঋষিকেশের রাস্তা ছেড়ে শিবানন্দ-পুরের রাস্তা ধরেছে। এই মুহূর্তে আর কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল না।

শিবানন্দপুরের রাস্তার কিছুটা এগিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে একটা ছোট বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। টাঙা থেকে লছমী লাফিয়ে নীচে নেমে হাত বাড়িয়ে বলল,

—আসুন বাবুজী।

আমি টাঙা থেকে লছমীর হাত ধরে নেমে এলাম। দেহে আমার নেই কোন শক্তি। রূপ টাঙা থেকে পক্ষীরাজকে খুলে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে এল। বুঝলাম এটা ওদের বাড়ী। বাড়ীর বাসিন্দা বলতে রূপ সিং আর লছমী। দুটো মাত্র ঘর। সামনে এক ফালি বারান্দা। বাড়ীর চারি দিকটা পাচিল দিয়ে ঘেরা। ঘোড়া রাখার আলাদা জায়গা রয়েছে। সব কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আমাকে নিয়ে লছমী একটা ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের ভিতরে একটা খাটিয়ায় বেশ পরিষ্কার বিছানা পাতা রয়েছে। শিয়রের কাছে একটা জলের কুজা। একটা টিনের বাক্স। ছোট একটা নড়বড়ে আলনা। আলনার উপরে লছমীর দু-একটা কাপড় পাট করে সাজান রয়েছে। রূপের জামা প্যান্টও ঝুলছে সেখানে। কয়েকটা স্টিলের থালা, গ্লাস, বাটি মেঝের উপর উপুড় করে সাজান রয়েছে।

লছমী আমার দিকে ফিরে বললে,

—ঐ খাটিয়াটার উপরে বসুন বাবুজী। একটু বিশ্রাম করে হাতমুখ ধুয়ে নিন। পানী ওখানে আছে। আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।

আমি রেগে গিয়ে বললাম,

—তোরা আমায় এখানে নিয়ে এলি কেন?

লছমী আমার রাগ দেখে আবার হাসতে শুরু করল। ওর হাসি দেখলে আমার আর রাগ থাকে না। ও হাসতে হাসতে বলল,

—এখানে না এলে রাত্রবেলায় কোথায় ছেড়ে দিব আপনায়? ঋষিকেশে যেমন সাধু সন্ন্যাসী আছে, তেমন এখানে অনেক বদমাসও এসে জুটেছে।

যেমন এনেছিস, তেমন বুঝবি মজা। আমি আর এখান থেকে যাবনা। হাসি তখন তোর বেরিয়ে যাবেরে লছমী?

আমার কথা শুনে লছমীর হাসি থেমে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার পানে। যেন এমন কথা কোনদিন শোনেনি ও। তারপরই ছুটে এসে ক্ষপ করে আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরে আব্দারের সুরে বলতে লাগল,

—থাকবে বাবুজী? থাকবে আমাদের কাছে? আমরা তুজনে তোমায় যত্ন করব। আদর করব। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি থাকবে আমাদের কাছে?

মহাবিপদ তো। ধমকালে হাসে। থাকার ভয় দেখালে আগ্রহ করে রাখতে চায়। এ যেন 'ছাড়ালে না ছাড়ে কি করিব তারে'।

হিন্দুরা জন্মান্তর বাদ বিশ্বাস করে। আমি হিন্দু। আমিও অবিশ্বাস করি না। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে লছমী রুপের সাথে আমার জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক। ওরা আমার কত আপন। এ যেন মাত্র কয়েক ঘন্টার পরিচয় নয়। লছমীর অবস্থা দেখে আমি হেসে ফেল্লাম।

—রাখবি তো। কিন্তু খেতে দিবি কোথেকে? আমি ভীষণ আলসে, কুঁড়ে মানুষ। কোন কাজ করতে পারব না। বসে বসে খাব আর ঘুমোবো।

মনে হল লছমী একটু আহত হয়েছে। জিবটাকে কামড়ে বললে—ছি! বাবুজী। তুমি কেন খাটতে যাবে আমরা তুজন থাকতে? রুপা খুব খাটতে পারে। আমিও পারি। দরকার হয় আর একটা ঘোড়া লিব। আমিও গাড়ী চালাব। খুব ভাল হবে। খুব মজা হবে।

লছমী হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। তার পর মুহূর্তেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিইয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল,

—আমি জানি বাবুজী, তুমি থাকবে না। তোমার ঘর আছে, তোমার বাড়ী আছে, তোমার টাকা আছে। তোমার সব আছে। তুমি কেন কষ্ট করে থাকতে যাবে আমাদের সাথে।

মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় লছমী। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। এটাও একটা জগৎ। সংসারের কুটিল ছায়া এখনও ওদের গ্রাস করতে পারে নি। ওরা গরীব হতে পারে। শিক্ষা ওদের কম থাকতে পারে। কিন্তু মন অমার্জিত নয়। গরীব হলেও ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে পেটের খাদ্য যোগায়। ওদের মনটাও ঘোড়ার মত

ছোটো। ওদের ঘর ছোট, মন ছোট নয়। এ মনের বোধ হয় পরিমাপ করা যায় না। ওদের এই ছোট ঘরে ওরা গড়ে তুলেছে সুখের রাজ্য। ওরা যে ঋষিকেশবাসী!

বাস চলেছে ঋষিকেশ ছেড়ে দেরাদুনের পথে। সকালে রূপ সিং এবং লছমী অনিচ্ছা সত্বেও পৌঁছে দিয়েছিল আমায় বাস ষ্ট্যাণ্ডে। তুলে দিয়েছিল দেরাদুন যাবার বাসে। খুব ভোরে উঠে লছমী আমার জন্যে খাবার তৈরি করে পোটলা বেঁধে আমার ব্যাগে পুরে দিয়েছিল। আমি নিতে চাইনি, একরকম জোর করে দিয়েছিল। ক'টা দিন ওদের ওখানে থাকার জন্যে অনুরোধ করেছে বার বার।

লছমী বলেছিল,—আজ যেও না বাবুজী।

—তা হয় না লছমী। তোরা দুঃখ করিস না। আমি আবার আসবো।

রূপ সিংএর চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছিল। মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে ভারী গলায় বলেছিল,

—লছমী, বাবুজী তোকে ফাঁকি দিচ্ছে রে। আমরা তো গরীব। আমাদের বাড়ী কি বাবুজী আর আসবেন? আর আসবেন না।

আমি রূপ সিংকে কোন কথা বলতে পারিনি। কষ্ট যে আমারো হচ্ছিল না তা নয়। তবুও যেতে হবে আমায়। যেতে হবে ঋষিকেশ ছেড়ে যে স্থলে সীতা বৌদিদের সাথে আর দেখা হবে না। লছমী কিন্তু বিশ্বাস করেছিল আমার কথায়। ওর সজল চোখ দুটো আমার মুখের উপর ন্যাস্ত করে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলেছিল,

—আবার যখন আসবে বাবুজী, আমাদের ঘরে আসবে তো?

ওর ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব থাকতে পারিনি আমি। আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল। স্বযত্নে তা দমন করে, একটু ম্লান হেসে বলেছিলাম,

—আসবো লছমী। আবার যখন ঋষিকেশ আসবো, তোদের কাছে আসবো। তোদের দুজন কে কি ভুলতে পারি? তোরা যে আমায় ভালবাসার ডোরে বেঁধে ফেলেছিস। রূপ আর তুই? তোদের ভোলা যায় না। ভুলবো না তোদের। কাঁদিস নি লছমী। কাঁদিস নি। বলেছি তো আবার আসবো।

বাসে ওঠার আগে রূপের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললাম,

—এ টাকা কটা রাখ। ওটা দিয়ে লছমীর একটা কাপড় আর তোর একটা জামা বানিয়ে নিস।

—না বাবুজী, ও আমি নিতে পারবো না। আপনি পথে বেরিয়েছেন। আপনার দরকার হবে। আপনার ভালবাসা পেয়েছি। এই আমাদের যথেষ্ট।

বাধ্য হয়ে রূপকে ধমক দিয়ে ওর পকেটে এক রকম জোর করে টাকা কটা পুরে দিয়ে ছিলাম।

—আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমার কাছে টাকা আছে। লছমীর সাথে ঝগড়া করিস না। কেমন?

লছমীর দিকে ফিরে ওর কান্নায় ভেঙ্গে পড়া মুখখানা তুলে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম,

—লছমী কাঁদিস না। তুই হাসলে তোকে ভারী সুন্দর দেখায়। আমি যাবার সময় তোর সেই হাসিটুকু দেখতে চাই। রূপের পক্ষীরাজকে ভাগ করে খেতে দিস। রূপের দিকে নজর রাখিস। ও তোকে মেলায় বেড়াতে নিয়ে যাবে। ওর সাথে কখনও ঝগড়া করিস না। এবার আমি চলি আমার বাস এসে গেছে।

লছমী পারেনি হাসতে। হাসতে গিয়েই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে ও আবার। রূপ সিং কান্না ভেজা গলায় লছমীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ও নিজেই কেঁদে দিয়েছিল।

—এই লছমী কাঁদিস না। বাবু বলেছেন। হ্যাঁ বাবু বলেছেন, আবার আসবেন। আবার আসবেন বাবুজী। আবার আসবেন।

বাস ছেড়ে দিয়েছিল। শেষ বারের মত তাকালাম ওদের দুজনের দিকে। লছমী, রূপসিং ওরা পাহাড়ের একজোড়া ময়ূর ময়ূরী। ওরা হাসে। প্রাণ খুলে হাসে। ওরা কাঁদে, হাহাকার করে কাঁদে। ওরা ছোটে। ঘোড়ার মত ছোটে। ওরা সহজ ওরা সরল। ওরা শিশুর মত সহজ সরল। লছমী রূপ সিং ভুলবো না। ভুলবো না কোন দিনও তোমাদের। তোমাদের ঘরকে বানিয়েছ তোমরা স্বর্গ। ও স্বর্গ ছেড়ে আমারো যেতে ইচ্ছে ছিল না। তোমাদের মায়া আমাকেও বেঁধে ফেলেছিল। ও মায়া কাটায় কার সাধ্য। তপোভূমি ঋষিকেশ। সাধনার পীঠ ভূমি ঋষিকেশ। লক্ষ্মণ করেছেন সাধনা। কত সাধক আজো তোমার তপোভূমিতে ধ্যানমগ্ন। তবুও তুমি মায়ায় জড়িয়ে আছ। যারা আসে তাদের জড়াও। হায় সাধন তীর্থ ঋষিকেশ! তুমিও মায়া কাটাতে পারলে না? একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। লছমী রূপ সিং রইল পেছনে পড়ে। অনেক দূরে অনেক দূরে।

॥ তেরো ॥

ডেরা কি দ্রোণ। দেরাদুন, কৌরব পাণ্ডবদের অস্ত্র শিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্য। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র দ্রোণাচার্য। এই দ্রোণাচার্যের ডেরা দেরাদুন। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে অবস্থিত দেরাদুন। কিন্তু কে বুঝবে অত উঁচুতে অবস্থিত। দেরাদুন যাবার আগে যখন দেরাদুনের কথা শুনতাম মনে কল্পনা করতাম অনেক উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ভাবতাম দেরাদুনের পাহাড়ে দাঁড়ালে নীচের অনেক কিছু নজরে পড়বে।

কিন্তু দেরাদুনে এসে যখন দাঁড়ালাম, মনে হল, সমভূমির কোন শহরে এসে পৌঁছেছি। স্বপ্ন ভেঙে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। শুনেছি দেরাদুনে এক বিরাট উপত্যকা। উপত্যকা সম্পর্কে আমার ধারণা কম। এবারে অনেকটা ধারণা হল। দেরাদুন শহর দেখে আমার যেন মনে হয় অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মত। শহরটা কিছুটা উঁচুতে। কিন্তু তার আস পাশ ঢাল হয়ে গেছে। তার পরেই আবার পাহাড়। খুব অল্প কথায় আমার ধারণাটা বললে বলতে হয়, চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত কচ্ছপের পিঠের মত দেরাদুন।

প্রায় দুশো মাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ এই উপত্যকায় সবুজের সমারোহ। যেদিকে তাকাই শুধু শাল, চীড়, দেওদার, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া নজরে পড়ে। আম এবং লিচু গাছও এদিকে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে বনানীর দিকে তাকালে মনে হবে যেন সাজানো অরণ্য। কোথাও ঢাল, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচুভূমি। এমন একসময় ছিল, যখন গোটা দেরাদুন উপত্যকার বিস্তীর্ণ অরণ্যে হাতী, বাঘ, ভাল্লুক, লেপার্ড, চিতাল, নেকড়ের দলের ছিল মুক্তাঞ্চল। তখন মানুষকে পথ চলতে হতো সশঙ্কিত অবস্থায়। মানুষ চলতো দল বেঁধে। নানাবিধ পাখীর ডাকে বন হতো মুখরিত। আজ কিন্তু সে অবস্থা আর নেই। অরণ্য সরে গেছে দূরে। পত্তন হয়েছে নগরের পর নগর। আসার পথে লক্ষ্য করলাম সরকারী উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ হচ্ছে। অরণ্য শুধু মানুষের নয় প্রকৃতির একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ। এর অভাব ঘটলে কেবলমাত্র মানুষ নয়, অনেক প্রকৃতির জীবকে পৃথিবী ছেড়ে অকালে বিদায় নিতে হবে। এরই ফল স্বরূপ এই দেরাদুনে গড়ে উঠেছে গবেষণা এবং বন সংরক্ষণের জন্য বিরাট এক প্রতিষ্ঠান। যেমন দেখবার মত তেমনি জানবার মত। আমারতো মনে হয় একটা মানুষ ওখানে

দিনের পর দিন দেখলেও তৃপ্তি মেটানো সম্ভব নয়। অন্ততঃ আমারতো মেটেনি। এই প্রতিষ্ঠানটি এত বড় যে এর শুধুমাত্র ঘরগুলি দেখতেই তিন-চার দিন লেগে যায়। দেখলাম কি ভাবে পোকার আক্রমণে প্রতিদিন কত মূল্যবান বৃক্ষ ধ্বংস হয়। দেখলাম এই ধ্বংসের হাত থেকে বৃক্ষকে বাঁচাবার জন্যে মানুষ কি প্রচেষ্টা নিয়েছে বা নিতে চলেছে। গবেষণা চলছে, চলছে মানুষের কর্মযজ্ঞ। আমার দেশের মানুষের এই কর্মযজ্ঞ দেখে সেই মুহূর্তে নিজেকে খুব গৌবান্বিত বোধকরলাম।

এই মুহূর্তে এই যজ্ঞগৃহের একটি সোপানে বসে চিন্তা করছি কত কথা। মন চলে যায় কোন সুদূরে। আমার প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত করলাম এই ধরিত্রীর অঙ্কে। ধরিত্রী তার নবজাত সন্তানের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তখন কি বুঝতে পেরেছিলেন মাতা ? এই ক্ষুদ্র শিশু একদিন শুধুমাত্র চাঁদকে দেখবে না। হাত বাড়িয়ে দেবে চাঁদের দিকে, তাকে ধরতে। সেদিন কি বুঝতে পেরেছিলেন ধরিত্রী, তার এই অসহায় শিশু আকাশে পাতালে উড়াবে তার বিজয় বৈজয়ন্তী ? তখন কি মায়ের একবারও চিন্তা হয়েছিল, এই শিশুই একদিন ভায়ের রক্তে স্নান করিয়ে দেবে মাতৃদেহ। সেদিন কি একবারও চিন্তা হয়েছিল তার, এই শিশুই সানাবে ভ্রাতৃহত্যা, মাতৃহত্যার অস্ত্র ? একবারও কি উদয় হয়েছিল মায়ের মনে, এই নবজাত শিশুই যৌবনে ধারণ করবে একহাতে অমৃতকুম্ভ অপর হাতে ব্রহ্মাস্ত্র। না, ভাবতে পারেননি তিনি। ভাবা সম্ভবও ছিল না। কি করে ভাববেন ? যে শিশুর না ছিল চাল, না ছিল চুলো। শুধু উপরে সীমাহীন আকাশ, আর নীচে পথের ধূলো। জন্ম নিয়েই শিশু পাথর দিয়ে হানলো আঘাত। শৈশবে গদাহাতে চড়লো রথে, বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখলো তাকে। আর দেখলেন মা। আনন্দের শিহরণ জাগলো মায়ের বুকে। কৈশোরে শাণিত তরবারি নিয়ে চাপলো শিশু অশ্বপৃষ্ঠে। অশ্বখুরে উড়লো ধূলো আকাশের বুকে। শঙ্কিত হলো মাতৃবক্ষ ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায়। অবশেষে সেই ক্ষুদ্র শিশুই পেল যৌবন। উন্মত্ত যৌবন তাকে তাড়িত করলো দিক থেকে দিগন্তে, সাগর থেকে পাহাড়ে, পাতাল থেকে আকাশে। ভরা যৌবন ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে। সংযমের দৃঢ়বন্ধনে বাঁধতে পারলো না নিজেকে। যুবকের এক হাতে অমৃতকুম্ভ, অপর হাতে ব্রহ্মাস্ত্র। এক চোখে প্রেমের অশ্রু, অপর চোখে ধ্বংসের সংকল্প। যুবক বাজাচ্ছে বিষের বাঁশী। মৃত্যুর হাহাকার উঠলো হিরোসিমা নাগাসাকিতে। আঘাতের তাণ্ডবে মাতৃবক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো ফিনকি দিয়ে রক্ত। লাল রক্ত। তাজা টকটকে লাল রক্ত। এযে পরশুরাম। মাতৃহন্তা পরশুরাম। পরশুরামের বিচার হয়েছিল মাতৃহত্যার দায়ে। আটকে গিয়েছিল কুঠার তার হাতে। অনুশোচনা, অনুতাপের তাপানলে দগ্ধ করেছিলো পরশুরামের হৃদয়। অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের অমৃতধারা ক্ষমা করেছিল

তাকে। কিন্তু আমি যে পরশুরাম। হাতের কুঠার দিয়ে মায়ের বুকে হেনে চলেছি আঘাতের পর আঘাত। আঘাতের চরম যন্ত্রণায়, মায়ের আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপছে। কাঁপছে অসহায় মানুষের দল। যদি জাগে আমার অনুশোচনা, যদি জাগে আমার অনুতাপ, তবে কি আসবে? তবে কি আসবে এগিয়ে অমৃতের ধারা নিয়ে কোন ব্রহ্মপুত্র? হবে নাকি বিচার আমার? বিচারের বাণী কি নীরবে নিভৃতে কাঁদবে শুধু মাতৃবক্ষে মুখ বুজে? জবাব মেলেনি তার আজও।

সকাল সাড়ে নটা থেকে হেঁটেছি একা একা অনেকটা পথ। কয়েকটা পুরী আর দু কাপ চা ছাড়া পেটে পড়েনি আর কিছু। রাস্তার একটা কলে স্নানটা সেরে নিয়েছিলাম এই যা রক্ষা। নতুবা ও কাজটা আর সারা দিনে হোতো না। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছিলাম পাথরের সোপানে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম খেয়াল নেই। জেগে উঠলাম এক ভদ্রলোকের ডাকে। পরিষ্কার বাংলায় বললেন তিনি

—এই যে মশাই শুনছেন? কোথা থেকে এসেছেন?

উঠে বসে বড় বড় চোখ মেলে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলাম। বার দুই চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরা। হাতে দামী এ্যাটাচি। একটু দূরে একটা জীপ দাঁড়ান। জীপের ড্রাইভার এইদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ষ্টিয়ারীং-এ হাত দিয়ে। মনে হল ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করছে। ভদ্রলোক এই প্রতিষ্ঠানের কোন পদস্থ অফিসার হবেন। রংটা ফর্সা, দাড়ি-গোঁফ কামান। মনে হল ও মুখটা যেন আমার চেনা-চেনা। কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

ভদ্রলোক আমার এই হতভম্ব ভাব দেখে আবার বললেন,

– আপনি কি বাঙালী? কলকাতা থেকে এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনাকে যেন আমার চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

চিন্তার স্রোত বইছে। কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? 'এতক্ষণে মনে উদিল স্মরণে বালক কালের কথা।' আমারও এতক্ষণে স্মরণে এসেছে। আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম।

—মানিক! মানিক না?

আর বলতে দিল না ও আমায়। সবেগে আমার এই ধুলোভরা জামাকাপড়শুদ্ধ আমায় জড়িয়ে ধরল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজো মনের কোণে সে দৃশ্য আমার অঙ্কিত হয়ে আছে। আবেগজড়িত গলায় ও বলল,

—উঃ! কতদিন পরে তোর সাথে দেখা। আমি ভাবতেই পারিনি এইভাবে তোকে আবার দেখতে পাব।

আমি জোর করে ওর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে বলে উঠলাম,

—ছাড়, ছাড়। গায়ের ধুলো সব তোর সাদা জামা-প্যান্টে লেগে যাচ্ছে যে।

—ধ্যাৎ। তুই ছাড় তো। কতদিন পরে তোকে দেখতে পেলাম। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। তুই এখানে এভাবে শুয়ে আছিস কেন?

—সে সব কথা পরে বলবো। তার আগে বল, তুই কেমন আছিস? এখানে কি করছিস?

—আমি ভাল আছি। আমি এখানকার একজন ক্ষুদ্র কর্মচারী।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম,

—ক্ষুদ্র কর্মচারী পেছনে আরদালী। সামনে অপেক্ষা করছে জীপ। ক্ষুদে না বলে, বল দুধে।

মানিক একটু হাসল। আমার কথার কোন উত্তর দিল না ও। আমার একটা হাত ধরে বলল,

—তোর সাথে আর কেউ নেই তো?

—না।

—তবে আয়। আমার কোয়ার্টারে গিয়ে সব শুনবো।

—চল।

মানিক এবং আমি দুজনেই জীপে গিয়ে উঠলাম। জীপ ষ্টার্ট দিল। যেতে যেতে আমি মানিককে প্রশ্ন করলাম,

—তুই আমায় চিনলি কি করে?

ও হেসে বলল,

—তোর ঐ নাকের কাছের দাগটা দেখে। মনে আছে, ছেলে বেলায় ওটা নিয়ে তোকে কত ক্ষ্যাপাতাম। আর তুই রেগেযেতি। মনে নেই?

—সে আর মনে নেই।

—তোর ঐ কপালের কাটা দাগটা দেখে। মনে পরে? সেই ঘোষেদের বাড়ী? সেই আম বাগান? দুজনে মিলে আম চুরি করে ওদের ঘাটলায় বসে দুজনের মধ্যে ভাগ করা নিয়ে ঝগড়া। তুই দুটো আধপাকা আম লুকিয়ে রেখেছিলি। তোকে আমি রেগে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম। তুই গড়াতে গড়াতে নীচে গিয়ে পড়লি। তোর কপাল গেল কেটে।

—হাঁ, খুব মনে আছে। তুই আমায় ফেলে পালিয়ে গেলি। আমি গিয়ে তোর

বাবার কাছে বলেছিলাম। তোর বাবা তোকে বেধড়ক মার দিলেন।—সেই থেকে তোর সাথে পাঁচ ছয় মাস কথা বলিনি। অথচ ইচ্ছে হত কথা বলার। মনে পড়ে ?

মানিক হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে বলল,

—হাঁ হাঁ। খুব মনে পড়ে। হঠাৎ তোরা একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেলি। শুনেই আমি ছুটে গেলাম। তখন তোরা চলে গেছিস। আমার কি কান্না।

—জানিস, আমি ও আমার আগে তোর জন্যে খুব কেঁদেছি।

আমরা দুজনেই দুজনার দিকে তাকালাম। সেই মানিক, সেই আমি। আমি দেখছি মানিক কত বড হয়েছে। মানিক দেখছে আমি কত বড় হয়েছি। বাল্যের বন্ধু। কত কথা, কত খেলা, কত ভাব কত অভাব অথচ কত আপন। বাল্যের দুটি বন্ধু। মাঝে অনেক গুলি বসন্ত পেরিয়ে আবার দেখা। মানিক আর আমি। দুজনেই দুজনকে দেখে হো হো করে হেসে ফেল্লাম। এ হাসির হয়ত অর্থ নেই। আবার হয়ত আছে। আমাদের হাসির শব্দে ড্রাইভার চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকিয়ে একটু মুচ্‌কি হাসল। আমি সে দিকে ইসারা করতেই আবার দুজন হেসে দিলাম। এ হাসি প্রাণখোলা হাসি। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা হাসি। মহা উৎসাহে দুজনেই বাল্যের স্মৃতি চারন করতে করতে এগিয়ে চললাম। জীপ এসে দাঁড়াল মানিকের কোয়ার্টারের সামনে।

কোয়ার্টার বলতে মানিকের পছন্দ করা বাসা। এখানে মানিক একাই থাকে। আর থাকে সরজু প্রসাদ বলে কুড়ি বাইশ বৎসরের একটি ছেলে। এই সরজু প্রসাদ মানিকের রাধুনী কাম প্রাইভেট সেক্রেটারী। ছেলেটিও বেশ চট্‌পটে। রান্না বান্না ও খুব খারাপ নয়। ওর বাড়ী নাকি মথুরাপুর জেলায়। মানিক জানাল ছেলেটি খুব সৎ।

মানিক ওর একটা লুঙ্গি আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললে—নে, এটা পর। জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল। সরজু ওগুলা কেচে দেবে খন। হাত মুখ ধুয়ে আয়। প্রয়োজনে স্নান করে নিতে পারিস। আমার মনে হয় তোর খুব ক্ষিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি আয়। আমি খাবার বানাতে বলেছি।

—তোর কিন্তু এতটুকু পরিবর্তন হয়নি,

—তোর ও নয়।

আমি বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি মানিক চা নিয়ে রেডি হয়ে বসে আছে আমার জন্যে। আমায় দেখেই বলল,

—হ্যারে, তুই তাস খেলতে পারিস ?

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম,

—হঠাৎ তাস খেলার কথা তোর মনে পড়ল কেন?

—সন্ধ্যার সময় আমার তিনজন বন্ধু আসবে। ঐ সময়টা রোজ আমরা তাসের আসর বসাই।

—তিন জনই কি বাঙালী?

—দুজন বাঙালী। আর একজন গাড়োয়ালী। বেশ ভাল লোক। বাংলা বোঝেন। ইণ্ডিয়ান আর্মিতে কাজ করে।

—তাস খুব ভাল খেলতে না পারলে ও, কিছুটা জানি।

আমি চা খেতে খেতে মানিকের খবর কিছুটা নিয়ে নিলাম। মানিক ছোট। বড ভাই পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী করে। দিল্লীতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে আছেন। মানিকের বিধবা মা এবং মানিকের স্ত্রী ও আছে সেখানে। মানিক বিয়ে করেছে ছয় সাত বৎসর আগে। একটি মেয়ে হয়েছে। মেয়েটির বয়স বছর চারেক। ও মাসে একবার করে যায়। দুই তিন দিন থেকে চলে আসে। মানিকের ইচ্ছা স্ত্রী, কন্যা এবং মাকে এখানে নিয়ে আসার।

আমরা দুজন নিজেদের মধ্যে কথাবলার মধ্যে দুই ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকল। দেখেই বুঝতে পারলাম দুজনেই বাঙালী। মানিক আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

—ইনি সুকমল ব্যানার্জী, ইনি ইন্দ্রনীল চৌধুরী। আর ইনি আমার বাল্যবন্ধু।

আমি মৃদু হেসে নমস্কার করলাম। ওঁরাও প্রতি নমস্কার করল। মানিক ওদের বলল,—বসো ব্যানার্জী। বসো চৌধুরী। শিবাজী এবং সিংজী আজ আসবেন না?

ব্যানার্জী উত্তর দিল,—না। ওরা আজ কি কাজে যেন চক্রাতা চলে গেছেন। আমার সাথে সকালে দেখা হয়েছিল। বলে দিল।

—এইরে, তা হলে আজ তাস খেলা হবে না দেখছি। চৌধুরী তো তাস চেনেই না। এস তাহলে আজ গল্প করা যাক। কি বল?

সুকমল ব্যানার্জী এবং ইন্দ্রনীল চৌধুরী দুজনেই আগ্রহ সহকারে বললেন,

—হাঁ সেই ভাল। গল্পই হোক আজ।

মানিক আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে বলল,—ও আমার বাল্যবন্ধু। আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হবার পরে ওর সাথে আজই আমার দেখা। ও অনেক দেশ ঘুরেছে। গল্প বলার অভিজ্ঞতা ওর বেশী হওয়া উচিত। তোমরা কি বল?

ব্যানার্জী সজোরে বলে উঠল 'নিশ্চই।'

আমি প্রস্তাবটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম,—আপনাদের আদেশ আমি অবশ্যই মানতে বাধ্য। তবে আপনারা যদি প্রথমে আপনাদের এই দেরাদুনের কথা কিছু বলেন তবে ভাল হয়। কারণ আমি এসেছি দেখতে এবং জানতে—

চৌধুরী বাবু বললেন,

—দেখুন। আমরা এখানে এসেছি পেটের দায়ে চাকুরী করতে। অফিসে যাই বাড়ী ফিরে আসি। সন্ধ্যায় এখানে আড্ডা জমাই। তাস খেলি। ব্যাস। দেরাদুনে আছি তিন চার বছর ধরে। অথচ সত্যি কথা বলতে গেলে দেখিনি কিছুই। এইটুকুই জানি দেরাদুনের চাল বিখ্যাত। প্রচুর লিচু এবং আম জন্মে। দেরাদুনের মিলিটারী কলেজ, সহস্র ধারা, ডাকাতে গুহা ইত্যাদি দেখতে বহু দূর দূর জায়গা থেকে লোক আসে। আমার দেখা হয়ে উঠেনি। কিছু বাঙালী আছে। চাকুরী করে, ব্যবসা করে। এই পর্যন্ত বলতে পারি। তার বেশী কিছু জানি না। কি বল ব্যানার্জী?

ব্যানার্জীবাবু চৌধুরীবাবুর কথায় সমর্থন জানিয়ে বললেন,

—তা যা বলেছ চৌধুরী। এ যেন ঘরের গরুতে বাড়ীর ঘাস খায় না।

মানিক প্রতিবাদ জানাল,—তুমি আমাদের চার পেয়ে বানিয়ে দিলে ব্যানার্জী?

আমরা সকলেই হেসে ফেললাম। মানিক এবার আমার দিকে ঘুরে হাত দুটি জোড় করে মাথাটা খানিকটা নীচু করে বলল,—অতএব বন্ধুবর, আর নয় যুক্তি, এবার কর কিছু উক্তি।

আমি হেসে বলতে শুরু করলাম,—গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজো করছি। দেরাদুন সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি তাই বলছি।

'মানিক হাততালি দিয়ে উঠল,—চমৎকার। বন্ধুবর।

—সরযুর হাতের আর এক কাপ করে চা হলে ভাল হত না ভাই?

—সে আর তোকে হবে না বলতে। সরযূ সব জানে, সময় হলেই আনে।

আমি বললাম,—তুই কি আজকাল কবিতা-টবিতা লিখিস নাকি?

ব্যানার্জী বলল,—ওর কথা আর বলবেন না। ও একটি জুয়েল। ও জানে সব। ওর সম্পর্কে পরে হবে। আপনি এবার আরম্ভ করুন।

—ডেরা কি দ্রোন। দেরাদুন। মহাভারতের অস্ত্র শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যের আখড়া বা ডেরা—এই দেরাদুন। বর্তমানে এটি একটি আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে। এই উপত্যকার কিছুটা জায়গা জুড়ে মিলিটারী ট্রেইনিং কলেজ, বন সংরক্ষণ এবং গবেষণাগার, মেয়েদের কলেজ, সরকারী অফিস, আদালত নিয়ে সুন্দর সাজান শহর আজকের এই দেরাদুন। পাহাড়ের কোলে এই দেরাদুন। ভারতের রাজধানী দিল্লী এবং কলকাতার সাথে সরাসরি রেলপথে যোগাযোগ রয়েছে। এখান থেকে ইউ, পি সরকারের বাস যায় বিভিন্ন দিকে। বাসে প্রচুর ভিড়ও হয়। এমনকি যাত্রীরা বাসের ছাদে পর্যন্ত যাতায়াত করে। দেরাদুনের বাজারটিও ঘুরে দেখেছি বেশ জমজমাট। ব্যবসার দিক থেকেও এ শহরের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

প্রায় দুশো মাইল জুড়ে হিমালয়ের কোলে বিরাট উপত্যকা, দেরাদুন। একদিন এটা ছিল যেমন নির্জন, তেমনি অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এর পূর্বদিকে গঙ্গা আর পশ্চিমদিকে যমুনা। ভারতের দুটি প্রধান ধারার মধ্যে অবস্থিত দেরাদুন উপত্যকা। একদিকে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা অপরদিকে পুণ্যতীর্থ তপোভূমি হরিদ্বার। দেরাদুন উপত্যকার প্রাকৃতিক শোভা এককথায় অনবদ্য। এখান থেকে বেশীদূর নয়— সৌন্দর্য্যের রাণী মুশৌরী। হিমালয় পরিভ্রমণকারী মুশাফিরদের তালিকায় অবশ্যই দেরাদুন এবং মুশৌরী এ নাম দুটো থাকে।

এই প্রাকৃতিক শোভায় সমৃদ্ধ, নির্জন স্থানটিকে বেছে নিয়েছিলেন ভরদ্বাজ পুত্র দ্রোণাচার্য্য। কৌরব পাণ্ডব কুলের অস্ত্রশিক্ষক। আগামীদিনের কুরুক্ষেত্রের নায়কদের মহড়া হয়েছিল দেরাদুনের আখড়ায়। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে এ স্থানের দূরত্বও খুব একটা বেশী নয়। সেকালের ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকেই শিক্ষালাভ করত। সুতরাং কৌরব'রা একশত ভাই এবং পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই এখানে বসে গুরু দ্রোণাচার্য্যের কাছে অস্ত্রচালনা শিক্ষালাভ করেন। সামরিক শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত স্থানই বটে। পরবর্তীকালে, কুরুক্ষেত্রে গুরুর দান করা বিদ্যা গুরুকেই ফিরিয়ে দিয়েছিল অর্জুন, গুরুহত্যার বিনিময়ে। গুরুপুত্র অশ্বত্থামা নিয়েছিল তার বদলা পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ পুত্রকে রাতের অন্ধকারে, শিবিরে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। মহাভারত বলে বীরত্ব। আমি বলি নির্মম। শিশুহত্যা, গুরুহত্যা আজ কিন্তু আর নির্মমও নয়, নিষ্ঠুরও নয়, জল ভাত, রোমান্স।

পরবর্তীকালে ভারতে এল ইংরেজরা। বেনিয়া হল রাজা। ইংরেজরা এ স্থানটির উপযুক্ততা বিবেচনা করে গড়ে তুলল সামরিক শিক্ষা শিবির। দেরাদুন মিলিটারী ট্রেইনিং কলেজ ভারত বিখ্যাত। তাছাড়া ইংরেজদের এ স্থানটি নির্বাচনের আরো একটি কারণ রয়েছে। নেপালের গুর্খাদের এবং গাড়োয়ালের গাড়োয়ালীদের সৈন্য বিভাগে স্থান দেবার প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত ইংরেজরা। আবার এই দুটো জাতকে মনে মনে সমীহ করত প্রচুর। আবার অন্যদিকে এই গুর্খারাই গাড়োয়ালের উপরে অত্যাচার করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। ইংরেজরা অত্যন্ত সুচতুর জাত। গাড়োয়ালের পক্ষ সমর্থন করে গুর্খাদের পরাজিত করে গাড়োয়ালদের কাছ থেকে আদায় করে ব্রহ্মপুরার একটা মস্ত বড় অঞ্চল। উভয় জাতের কাছাকাছি সামরিক শিবির স্থাপন করে। এদের ভয় পেত বলে বিশ্বাস করত না। তার ফলে সজাগ হয়ে থাকতে হত ইংরেজদের। মার্জার বানরের পিঠে ভাগ করার গল্প আর কি।

আমি একটু থামলাম। ওরা তিনজনেই স্বপ্রসংশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হলাম।

বললাম,—এ সবই তো আপনারা জানেন। সুতরাং এ আর কি বলব?

ব্যানার্জীবাবু মানিকের বিছানায় প্রচণ্ড জোরে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলল,

—বলবেন না মানে। নিশ্চয়ই বলবেন। আমরা এখানে থাকি বলেই যে আমরা সব কথা জেনে বসে আছি এমন কথা আপনাকে কে বলল?

চৌধুরীবাবু ব্যানার্জীবাবুকে বাধা দিয়ে বললেন,

—দেখুন, আপনার বলার ষ্টাইলটা আমাদের ভাল লেগেছে।

মানিক আমার দিকে ফিরে হেসে বলল,

—তুই বলতো, আমাদের গ্রামে যে খালটা ছিল সেটা কোথা থেকে উৎপত্তি? জানিস না তো? অথচ ওখানে আমরা দীর্ঘদিন ছিলাম। তুই যে জেলায় বাস করিস, সে জেলার সব কথা তুই বলতে পারবি? পারবি না। এমনিই হয়। আমরা যেখানে থাকি তার কথা জানার কৌতূহল আমাদের থাকে না।

মানিক খানিকটা নড়েচড়ে বসে মহা উৎসাহে বলল,

—ব্যানার্জী, কাল শনিবার আছে। সুতরাং কাল যদি ছুটি নিই তাহলে দেরাদুন মুশৌরী বেড়ানর প্রোগ্রাম করা যায়। জীপ তো আমাদের আছেই। কি বল?

ব্যানার্জী সোৎসাহে বলে উঠল,

—গুড আইডিয়া। চল বেরিয়ে পড়ি। **Our captain is our new friend.**

পরের দিন সকালে অর্থাৎ শনিবার আমরা ছয় জন বেরিয়ে পড়লাম। মানিক, আমি, সরযু প্রসাদ, মানিকের ড্রাইভার, ব্যানার্জীবাবু এবং চৌধুরী বাবু। আমরা প্রথমে যাব সহস্রধারা থেকে তপোকেশ্বর মন্দির। তপোকেশ্বর মন্দির দেখার পরে হাতে যদি সময় থাকে, তবে রামাইয়াদের গুরু মন্দির। অর্থাৎ গুরু রাম রায়ের মন্দির। সকালের ব্রেকফাস্ট সাথে করে নেওয়া হয়েছে। মধ্যাহ্নের মিল রাস্তার কোন হোটেলে সেরে নেব। রাত্রে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

আমাদের জীপ এগিয়ে চলেছে দেরাদুন শহর ছাড়িয়ে রাজপুরের দিকে। পাহাড়ের গা কেটে কেটে অনেক উপরে উঠে গেছে রাস্তা। বাঁধান রাস্তা। দেখলাম জীপ, লরি, যাত্রী বোঝাই বাস, প্রাইভেট গাড়ী যাচ্ছে আসছে অনেক। রাস্তা উঠেছে এঁকে বেঁকে। এধারের কয়েকটা পাহাড় দেখলাম রুখা। গায়ের ধূসর বর্ণের পাথর গুলি বেরিয়ে পড়েছে। ছোট খাট সামান্য কিছু কিছু গাছ রয়েছে। আমরা যখন পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠে এসেছি নীচে তাকিয়ে দেখলাম বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেরাদুন উপত্যকা। এই রাস্তায় চলতে গেলে যে কোন ড্রাইভারকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই গভীর খাদে আশ্রয় লাভ।

আমরা যখন সহস্র ধারার কাছে এসে পৌঁছালাম তখন সকাল ৯টা বাজে। রোদের

তেজ অনেকটা বাড়লে ও খুব একটা গরম অনুভব করছিলাম না, দুই দিকে উঁচু পাহাড়ের সারি। মাঝখানে খাদ। আবার খানিকটা জায়গা সমতল। এই সমতল জায়গায় কয়েকটি দোকানপাট বসেছে স্থায়ী ভাবে। কয়েকটা চায়ের দোকানও রয়েছে। ওদিকের পাহাড়ে যাবার রাস্তা তৈরী হচ্ছে। সমতল জায়গায় যাত্রী বোঝাই বাসগুলি এসে দাঁড়ায়। যদিও আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু টার্ণ নিতে অসুবিধা হয় বলে ওখানেই রেখে দেয় বাস। ওপারে সহস্রধারা মাঝখানে অনেকটা নীচু খাদ। এপারে দোকানপাট, বসার বাঁধান চাতাল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঁধান বেঞ্চও রয়েছে বসার জন্যে। আমরা একটা গাছের তলায় পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে পড়লাম।

লতাগুল্মে বোঝাই পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে শত শত জলের ধারা। সরু সরু জলের ধারা। অনেকেই ওখানে বসে দিব্যি আরামে স্নান করছে। নাম সহস্র ধারা। সহস্রধারা আছে কিনা তাও গুণে দেখিনি বা কেউ দেখেছে কিনা জানিনা। তবে ধারা অনেকগুলো হবে। কাছেই একটা ছোট মন্দির। মন্দিরের মধ্যে কিছু পাথর বসানো রয়েছে। পুণ্যার্থীরা সেখানে শিবজ্ঞানে পুজো দিচ্ছে। একজন সন্ন্যাসী আমায় বলল, কপিল মুনি নাকি এখানে কিছুদিন সাধনা করেছেন। কোন চিহ্ন নেই। নেই কোন প্রমাণের পুস্তকাদি। সুতরাং বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিতে হয়। মনে পড়ে এই কপিল মুনিকে অহেতুক অপমান করায় সগর পুত্ররা হয়েছিল ভস্ম, মুনির রোষানলে পড়ে। আবার সেই সগর বংশের অংশুমান এবং ভগীরথের তপস্যার ফলে নেমে এসেছিলেন গঙ্গা মর্তভূমিতে। উদ্ধার হয়েছিল সগর বংশ। ভগীরথের নাম যুক্ত হয়েছিল মাতা গঙ্গার নামের সাথে। নাম হয়েছিল ভাগীরথী। কপিল মুনি আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন গঙ্গা এবং সাগরের মিলন সঙ্গমে। আজও যারা গঙ্গাস্নানে যান সাগর সঙ্গমে, দর্শন করেন পুজো দেন কপিল মুনির আশ্রমে।

এই সহস্রধারার কাছেই রয়েছে ঝর্ণা। কত আর উঁচু হবে? একটা মানুষের চাইতে সামান্য একটু উঁচু হতে পারে। কিন্তু জলের বেগ রয়েছে প্রচণ্ড। এক পাশে উঁচুতে সহস্রধারা। অপর পাশে বাঁধান চত্তর। মাঝখানে খাদ বেয়ে বয়ে চলেছে ঝর্ণার জলধারা। স্বচ্ছ টল টলে জল। ছোট ছোট প্রচুর মাছ ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। হাঁটু জলের বেশী হবে না।

ঝর্ণার ধারায় পিঠ দিয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। মনটা বেশ সতেজ হয়ে উঠল। সকলেই স্নানের জন্যে নেমে পড়েছিলেন। ঝর্ণার পিছনের এবং সহস্রধারার পাহাড় আবার অন্যান্য পাহাড়গুলির ন্যায় ন্যাড়া পাহাড় নয়। এখানে রয়েছে বিভিন্ন রকমের গাছ। গাছে গাছে পাখীর কূজন। ঝর্ণার কলতান। নির্জন পরিবেশ। এখানে

কোন স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেনি। ফলে প্রকৃতি মনকে আকর্ষণ করে বেশী। ভারী অপূর্ব! ভারী মনোরম! কপিল মুনি যদি এখানে তপস্যা করেই থাকেন তবে তা বলতে হবে উপযুক্ত পরিবেশই বটে। শান্ত পরিবেশে কবিদেরকেও আকৃষ্ট করবে রমোধিক।

জীপে উঠে মানিক আমায় বলল,—এবারে কোথায় যাওয়া হবে?

—তপোকেশ্বর। তবে বেলা অনেক হয়েছে। আমার মনে হয় সকলের ক্ষিদে পেয়েছে। অতএব রাস্তায় যদি কোন হোটেল-টোটেল পড়ে, খেয়ে নিলে ভাল হয়।

চৌধুরীবাবু বললেন,—সেই ভাল। আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

আমাদের জীপ এবার নামতে শুরু করল নীচের দিকে। কয়েকটা চা বাগানের মত নজরে পড়ল। দূর থেকে দেখেছি। তাই সঠিক বলতে পারলাম না। তবে দেরাদুনে চা হয় এবং চা বাগিচা আছে ঠিকই। আগেই বলেছি দেরাদুনে লিচু গাছ অনেক। লিচুও হয় প্রচুর। গাছে গাছে পেকে পেকে ঝুলে রয়েছে। এখানে আমও হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে। তবে অধিকাংশ আমই ছোট জাতের। অনেকগুলো বেশ গোলাকৃতি। গাছে গাছে আধপাকা পাকা আম দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিল।

জীপ অনেকটা এগিয়ে এসে একটা পাঞ্জাবীর খাবারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। হোটেলটা যদিও খুব একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় তাহলেও ক্ষিদের তাড়নায় ভাল মন্দ বিচার না করে ঢুকে পড়লাম। রান্না কেমন হয়েছিল বলব না। কি খেতে দিয়েছিল তার ও বর্ণনা দিলাম না। তবে খেয়েছিলাম অনেক। সবই অমৃত বৎ।

দেরাদুনে গেলে তপকেশ্বর না দেখে কেউ ফের না। তপকেশ্বর মন্দির এটি গুহা মন্দির বলাই বোধ হয় শ্রেয়। আম্রকুঞ্জের ছায়ায় ঘেরা তপকেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ মুখ। আমাদের জীপ এসে দাঁড়াল এই আম্রকুঞ্জের ছায়ায়। সামনেই বাঁধান একটা পাতকুয়া। তার পাশে ছোট একটা মন্দির। মন্দিরের গা বেয়ে বাঁধান সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে অনেক নীচে। মনে হবে পাতালে চলেছি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে ডান হাতের দিকে কয়েকটা মন্দির। মন্দিরে বিভিন্ন দেব দেবীগণের মূর্তি। সিঁড়ি নেমে গিয়ে মিশেছে একটি নদীর গায়ে। আমরা যখন গেছি তখন নদী শুকনো। ওপারে খাড়া পাহাড়। সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাঁক নিয়ে একটু এগোলেই বড় একটা গুহা। গুহায় শিবলিঙ্গ রয়েছে।. মাথা অনেকটা নীচু করে ঢুকতে হয়। বলতে গেলে একরকম হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা। বাইরে থেকে গুহায় ঢুকলে অন্ধকারে মনে হবে। একটু দাঁড়িয়ে চোখটাকে সইয়ে নিয়ে এগোতে সুবিধা হয়। গুহাটা বেশ বড়। ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়। এই তপোকেশ্বরে বছরে একবার করে মেলা হয়। এই মেলায় বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ আসে।

ফেরার মুখে আমি মাণিকদের প্রশ্ন করলাম—বলতো আমরা কটা সিঁড়ি ভাঙলাম ?

ব্যানার্জীবাবু বললেন,—তা তো শুণি নি। তবে অনেক গুলো হবে। আপনি বলতে পারবেন ?

আমি মুচকি হেসে উত্তর দিলাম,—যদি ভুল না করে থাকি তবে একশোটা।

চৌধুরী বাবু চোখ দুটো বিস্ফোরীত করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—সে কি ! আপনি গুনেছেন নাকি ? আপনি তো সংঘাতিক লোক মশাই।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। একটু মুচকি হাসলাম শুধু। মানিক স্বপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—দেখার জন্যে আলাদা চোখ চাই।

আমি মন্তব্য করলাম,—অবশ্য মনের তাগিদ থাকলে।

বোধ করি ব্যানার্জীবাবু মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন সকলে মিলে আমার প্রশংসা করায়। মানিকদের দলের মধ্যে ব্যানার্জীবাবুর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। সুতরাং তার স্থায়ী আসনটিকে তিনি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। ব্যানার্জীবাবুর নিজের সম্পর্কে ধারণাও অসীম। মানিক আমায় বলেছিল, ও একটু দাম্ভিক প্রকৃতির। নতুবা লোক ভাল।

ব্যানার্জীবাবু বললেন,—আপনি হরিদ্বার ঘুরেছেন ?

—হ্যাঁ।

—বলুন তো আকাশের সপ্তর্ষি অর্থাৎ যাকে আমরা সাতভাই বা Great Bear বলি সেই সাতজন ঋষিই কি হরিদ্বারের সপ্তর্ষি ?

মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। পণ্ডিত যদি ক্ষেপে যায় তবে তো আমার ভরাডুবি। আমার সব জারিজুরি ভেঙে যাবে। এবারে আত্মরক্ষা করে কোনমতে পিঠ বাচাই। মানিকের মুখের দিকে তাকাতে ওর চোখ দুটো যেন বলল, 'আমার মুখরক্ষা কর ভাই।'

আমি বললাম,—না। আকাশের সপ্তর্ষি মণ্ডল আর হরিদ্বারের সপ্তর্ষি এক নয়।

আকাশের সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতজন ঋষি হচ্ছেন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। এরা ধ্রুবলোক থেকে নীচে অবস্থান করেন। আর হরিদ্বারের সপ্তর্ষি হচ্ছেন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ভার্গব, কাশ্যপ, গৌতম এবং অত্রি এই সাতজন ঋষি গঙ্গার সাতটি ধারায় বসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। সেইজন্যে সপ্তর্ষিকে অনেকে সপ্তদ্বীপও বলে। আর প্রচলিত অর্থে সপ্তদ্বীপ হচ্ছে জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।

মনে হল ব্যানার্জীবাবু কিছুটা নিরাশ হয়েছেন। চৌধুরী এবং মানিক খুব পুলকিত হয়ে উঠল। কারণ মানিকের মুখে শুনেছি তর্কযুদ্ধ শুরু হলেই ব্যানার্জীর কাছে সকলকে হার স্বীকার করতে হয়। ফলে ওরা মনে মনে সকলেই চটে আছে ব্যানার্জীবাবুর উপর। ওরা কামনা করে ব্যানার্জীবাবুর একটা পরাজয়।

চৌধুরী জিব দিয়ে মুখে চুক চুক শব্দ করে ব্যানার্জীবাবুকে খোঁচা দিয়ে বললেন,

—ব্যানার্জী এ উত্তরটুকু অন্ততঃ ওনার কাছ থেকে আশা করতে পার ?

—আমি বুঝলাম এটা চৌধুরীবাবুর উল্লাস। মনে মনে বললাম,

'মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে,
শান্ত কল্লে বকে,
বেঙের শোকে সঁাতার পানি
দেখি সাপের চোখে।'

তপকেশ্বর মন্দির ছেড়ে আমরা এলাম গুরুরাম রায়ের মন্দিরে। এই গুরুরাম রায় মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের অনুমতি নিয়ে আসেন দেরাদুনে। দেরাদুনে চলছে তখন প্রচণ্ড অরাজগতা। মুঘলরা চেষ্টা করছে অবিরাম তরবারীর খোঁচায় কাফের গাড়োয়ালদের কাবু করে রাখতে। রক্তের স্রোতে দেরাদুন উপত্যকা হয়ে উঠেছে লালে লাল। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে প্রজারা। হিন্দু-মুসলমানের এই চরম বিদ্বেষের মধ্যে এলেন গুরুরাম রায়। এলেন মহামিলনের মন্ত্র নিয়ে। ঐক্যের সাধনায়, মিলনের সাধনায় ব্রতী হলেন গুরুরাম রায়।

এই গাড়োয়ালী জাতটা একদিকে যেমন সহজ সরল এবং বিশ্বাসী, অপরদিকে তেমনি কষ্টসহিষ্ণু এবং সাহসী। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যাই কত ঝড় বয়ে গেছে এই জাতটার উপর দিয়ে। তিব্বতের লামারা, নেপালের গুরখারা এবং মুসলমানরা বার বার আঘাত হেনেছে এদের উপর। ভেঙেছে, গড়েছে এদের রাজ্য। ইংরেজরা বন্ধু সেজে এসে মেরেছে ছোবল। এসব সত্বেও এরা টিকে আছে। বেঁচে আছে। টিকে থাকবে, বেঁচে থাকবে। ভারত স্বাধীন হয়েছে দীর্ঘদিন হল। অথচ গাড়োয়ালের মীমাংসা কিন্তু আজো হয়নি। এদের কিছু অংশ রয়েছে পাঞ্জাবের মধ্যে কিছু নিয়েছে উত্তর প্রদেশ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সামগ্রীক অগ্রসরতার তুলনায় এরা পেছিয়ে রয়েছে অনেক। এটা নিয়ে ভাবা দরকার। ভাবতে হবে। দেহের একটা অঙ্গ অসুস্থ রেখে গোটা শরীরকে সুস্থ রাখা যায় না।

আবার আসি গুরুরাম রায়ের কথায়। দেরাদুনে গুরুরাম রায়ের মন্দির খুবই বিখ্যাত। পরিব্রাজকদের পক্ষে এটা দর্শন করা একান্ত উচিত। দর্শন করা উচিত সেইসব মুসলমান এবং হিন্দুদের যারা ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে রাতের অন্ধকারে হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওদের বিচারের দিন আগত। ভারতবর্ষের ইতিহাস কোনদিন ক্ষমা করেনি এইসব ধর্মান্ধদের। ইতিহাস ক্ষমা করেনি কালাপাহাড়, সুলতান মামুদ ঔরঙ্গজেবদের। কবরের তলায় শুয়ে কি পরম শান্তিতে ঘুমোতে পারছেন পাকিস্থানকে বুকে ধারণ করে জিন্নাসাহেব? অথচ আকবর, অশোক, নানক, কবির আজো অধিষ্ঠিত আছেন ভারতবাসীর হৃদয় আসন জুড়ে। ভারতবর্ষ গায় ঐক্যের গান বিভেদের নয়। নাভিশ্বাস উঠেছে সংকীর্ণতাবাদের। মৃত্যুপথযাত্রী শেষ বারের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। ও রুগী বাঁচবে না। মৃত্যু ওর অবধারিত। জয় সাম্যের জয়। জয় শাশ্বতঃ মানব জাতির জয়। এই সাম্যের গান গাইতেই এসেছিলেন গুরুরাম রায়।

এই শাশ্বতঃ মানবজাতির জয়গান গাইতেই এসেছিলেন গুরুরাম রায়।: মানুষে

মানুষে মিলনের বাণী নিয়েই ঘুরেছেন তিনি দেরাদুনের লাঞ্ছিত মানুষের দরজায় দরজায়। রাম রায়ের শিষ্যবৃন্দকে বলে রামরাইয়া সম্প্রদায়। মন্দিরের গঠনশৈলীর উপরে মুঘল স্থাপত্যের প্রভাব নজরে পরে। গুরুরাম রায়ের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মন্দিরে রক্ষিত আছে। খুটে খুটে দেখলে আরো ভালভাবে দেখার অনেক কিছু আছে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি ঝড়েরগতিতে এলাম, দেখলাম, চলে গেলাম হলে আহরণ করা যায় না কিছু। মেটেনা মনের ক্ষুধা, তৃপ্ত হয় না মনের বাসনা। সারাদিন একনাগাড়ে প্রোগ্রাম করে দেহ এবং মনের উপর পড়েছে প্রচণ্ড চাপ। মন এখন চায় একটু বিশ্রাম। সুতরাং এবারে আর হল না। বাসনা রইল আবার আসব।

মানিক আমার দিকে ফিরে বলল,

—এখানে খুব বড় একটা মেলা হয়। দেরাদুনের সবচাইতে বিখ্যাত মেলা। ঝাণ্ডা মেলার কথা তুই নিশ্চয়ই শুনেছিস?

—হ্যাঁ, শুনেছি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে মানিক আমার বলল,

—চল ছাদে গিয়ে বসা যাক খানিকক্ষণ।

আমি এবং মানিক চলে এলাম ছাদে। দুজনে দুটো ইজিচেয়ারে পরম আরামে গা এলিয়ে দিলাম। এখান থেকে রাতের আলোক উজ্জ্বল দেরাদুন শহরকে নজরে পড়ে। বিদ্যুতের আলোর মেলায় সেজেছে দেরাদুন শহর। দূরে কালো পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এখন আর সবুজ বনানী নজরে পড়ে না। দেরাদুন শহরে আছে সব। সিনেমা হল থেকে শুরু করে অফিস কাছারী, খেলার মাঠ, পার্ক, বাজার। আধুনিক শহর। লোকবসতিও মন্দ নয়। স্টেশন এলাকাটা খানিকটা গিঞ্জী। সাধু সন্ন্যাসী বড় একটা দেখলাম না। মিলিটারীদের আনাগোনাই বেশী। দিনের দেরাদুনের জন-কল্লোল রাতের দেরাদুনে হয়ে আসে স্তিমিত। যত রাত বাড়ছে ততই চঞ্চল দেরাদুন ঘুমিয়ে পডছে। নীল আকাশের শত শত নক্ষত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে দেরাদুনকে। কতকাল আগে দেখেছে ওরা দেরাদুনকে। দেরাদুনের কত উত্থান পতনের সাক্ষ্য ওরা। আজোও দেখছে।

মনিক বলল,—কি ভাবছিস?

—ভাবছি অনেক কথা। ভাবনার কি আর শেষ আছে। ওসব কথা ছেড়ে দে। তুই তো বন গবেষণা বিভাগে কাজ করছিস। তোর কাজের কথা কিছু বল।

—আমার কাজের কথা আর কি বলব? ও তোর ভাল লাগবে না। যারা বোবা তাদের নিয়ে আমাদের কাজ।

ওর কথাটা আমি ভাল করে বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম অবাক হয়ে।

—বুঝতে পারলি না তো? এটা তো সোজা কথা। গাছ কি কথা বলে? ওদের তুই মার, কাট, গালাগালি দে, প্রশংসা কর। কিছু বলবে না। অথচ ওদের ব্যথা আছে, বেদনা আছে। সোহাগ করলে, আদর করলে সাড়া দেয়। আমরা যারা

ওদের নিয়ে বাস করি তারা বুঝি ওদের ভাষা। আমরা জানি প্রতিনিয়ত ওরা মানব জাতির কত উপকার করছে। অথচ প্রতিনিয়ত ওদের সংখ্যা লোপ হয়ে যাচ্ছে মানুষ, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির আক্রমণে। কে তার খবর রাখে?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ওর বুক থেকে। মনে মনে বুঝলাম ও শুধু গাছপালা নিয়ে গবেষণাই করে না। গাছপালাকে ভালবাসে। হবে না কেন? আচার্য জগদীশ বোস তো এই বাংলারই ছেলে ছিলেন।

মানিক একটা হাই তুলে বলল,

—ছেড়ে দে ওসব কথা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুব টায়ার্ড লাগছে। আবার তো কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে। রাতও অনেক হল। চল, শুয়ে পড়ি গে।

—চল।

পরের দিন সরজুপ্রসাদের ডাকে ঘুম ভাঙল। মানিক আমার ওঠার আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। ও আমায় বলল,

—নে, এবার ওঠ। চট্‌পট্‌ Ready হয়ে নে। ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে। আমরা এখানেই Break fast সেরে নেব। মুশৌরীতে গিয়ে হোটেলে খাব। স্নানটা এখানেই সেরে নে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি ব্যানার্জীবাবু এবং চৌধুরীবাবু চলে এসেছেন। আমায় দেখেই হেসে বললেন,

—সুপ্রভাত।

—সুপ্রভাত। আপনারা Ready?

—Yes, ready sir.

—রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

ব্যানার্জীবাবু উত্তর দিলেন একটু হেসে,

—আমার হয়নি। রাতে মহাভারতের দ্রোণাচার্য্য আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।

আমি হেসে প্রশ্ন করলাম,

—কি বললেন আপনাকে দ্রোণাচার্য?

চৌধুরীবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ব্যানার্জীকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

—ব্যানার্জীর কাছে পাশুপত অস্ত্র দিয়ে গেছেন, আপনাকে হত্যা করতে। আমি এবং মানিক দুজনেই হো হো করে হেসে ফেললাম। ব্যানার্জীবাবু মুখখানা গোমরা করে বসে রইলেন।

জীপ চলেছে মুশৌরীর পথে। দুপাশে বনানী। সামনে পাহাড়। মুশৌরী পাহাড়। ঐ তো দেখা যায় মুশৌরী পাহাড়। আরো খানিকটা এগিয়ে যাই। ঐ তো মুশৌরী। আবার খানিকটা এগিয়ে যায় আমাদের জীপ। মুশৌরী যেমন দূরে ছিল তেমনি থেকে যায়। ভুল ভাঙল। বুঝলাম এ যে পাহাড়ের মরিচিকা। একসিলেটারে চাপ পড়ছে। প্রপেলার গর্জন করছে। দ্রুত বনানীর সারি সরে সরে

যাচ্ছে পেছনে। কখনও উঁচুতে উঠছি। কখনও নামছি নীচে। কখনও ডাইনে ঘুরছি। কখন বাঁয়ে। এ যেন একটা মস্তবড় অজগর সাপ এঁকে বেঁকে চলে গেছে—দূর হতে দূরে। এখান থেকে মুশৌরী পাহাড় একবার উঁকি মেরে দেখছে আমাদের। আবার অরণ্যের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছে। চলছে লুকোচুরি খেলা আমাতে আর মুশৌরীতে। অবশেষে সুন্দরী মুশৌরী আমায় সামনে খুলল তার অবগুণ্ঠন।

হাঁ করে তাকিয়ে আছি আমি। ওখানে উঠতে হবে আমাদের! আমরা জীপে করে চড়বো ঐ মেঘলোকে! ছোট ছোট দিয়াশালাইয়ের বাক্সের মত বাড়ীগুলো, দুই-তিন তলা হয়ে দেখা দেবে আমাদের সামনে। স্পষ্ট নজরে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা রেখা উঠে গেছে উপরে। অনেক উপরে। মুশৌরী পাহাড়ের মাথায়। ঐ স্বপ্নলোকে। দম দেওয়া খেলনা গাড়ীর মত এঁকে বেঁকে উঠছে লরি, জীপ, বাস। ভারি অপূর্ব। মনে পড়ে ঘুম, কার্শিয়াং-এর দৃশ্য। দার্জিলিং যদি রাজা হয়, মুশৌরী তার রাণী। সৌন্দর্যের রাণী মুশৌরী।

ব্যানার্জীবাবু অনেকক্ষণ থেকে চুপচাপ বসে আছেন। মনটায় পীড়া দিচ্ছিল। নিজেকে কিছুটা অপরাধী বোধ করছিলাম। হতে পারে ভদ্রলোক নিজেকে এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধিকে জাহির করতে চায়। তা অনেকেই তো চায়। ওটা এমন কিছু দোষাবহ নয়। যারা পরাজিত হয় তারাই রেগে যায়। তাই বলে গুণীর মর্যাদা দিতে হবে না। আর তাছাড়া ভদ্রলোক তো সত্যিই জ্ঞানী। যথেষ্ট ভদ্রও বটে। আমি ব্যানার্জীবাবুর দিকে ফিরে বললাম,

—ব্যানার্জীবাবু এত চুপচাপ হয়ে গেলেন কেন? কিছু বলুন?

ব্যানার্জীবাবু একটু ম্লান হেসে বললেন,

—আমি কিছু বলতে গেলেই তো চৌধুরী মনে করবে আপনাকে হেয় করতে চাইছি।

চৌধুরী একটু মুচকি হাসলেন। আমি প্রতিবাদ করে বললাম,

—আরে না না। আপনি মোটেই তা চান না। চৌধুরীবাবু ওটা কৌতুক করার জন্যে বলেছেন। আপনি বলুন।

—আপনি কাল গুরুরাম রায়ের মন্দির সম্পর্কে বলছিলেন অথচ তার সম্পর্কে তো কিছু বললেন না?

চৌধুরী বাবু সুযোগ পেয়েই তার সদ্ব্যবহার করলেন,

—ওটা তো তোমার বলার জন্যে উনি Complite করেন নি। ওটা আজ তুমি বল।

আমি হেসে দিয়ে বললাম,—চৌধুরীবাবু যা বলেছেন তা একদিকে ঠিক। ওর বেশী আর আমার জানা নেই। আপনি জানলে বলুন।

ব্যানার্জীবাবু আমরা হেরে গেছি দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন,

—গুরু রাম রা য়র বাড়ী ছিল পাঞ্জাবে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। ঔরঙ্গজেব ছিল প্রচণ্ড পরধর্ম অসহিষ্ণু। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা, রাজপুতরা, পাঞ্জাবের শিখদের সাথে সংঘর্ষ বাধে তার। এই সময় শিখদের গুরুপদে ছিলেন গুরু হর রায়। হর রায় ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হলেন। অবশেষে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রায়কে মুঘল দরবারে জামিন রেখে মুক্তি পেলেন। গুরু হররায়ের মৃত্যু হলে গুরুপদ লাভ করেন তার পুত্র হরকিষণ। হরকিষণের পরে আসেন তেজবাহাদুর। এদিকে গুরু রাম রায় ঔরঙ্গজেবের অনুমতি নিয়ে চলে আসেন দেরাদুনে। শুরু করেন সাধনা। ক্রমেই গুরু রাম রায়েরগুণে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে শুরু করেন। গুরু রাম রায়ের শিষ্যদের বলে রামরাইয়া।

চৌধুরীবাবু এবং মাণিক দুজনেই হাত তালি দিয়ে উঠল। আমি বললাম,

—চমৎকার। ভারী সুন্দর বলেছেন।

দেরাদুন ছাড়িয়ে আমাদের জীপ এবার মুশৌরী এলকোয় ঢুকে পড়েছে। যে পাহাড়ের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে আমাদের জীপ উঠছে, সেটা মুশৌরী পাহাড় নয়। মুশৌরী পাহাড় আমাদের সামনে। ঐ পাহাড়ে যেতে হবে এই পাহাড়কে টপকে। যাবার রাস্তা সব জায়গা চওড়া নয়। বাঁকের মুখে কিছুটা চওড়া। ফলে উল্টো দিক থেকে লরি বা বাস আসছে, আগে থেকেই উভয় পক্ষ হর্ণ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে। 'আমি আসছি এবার তুমি বাঁকের মুখে জায়গা নিয়ে দাঁড়াও।' একটু ভুল বোঝাবুঝি হলে আর রক্ষে নেই। কয়েক হাজার ফুট নীচে সমাধি লাভ। নীচের দিকে তাকালে মাথা ঝিম ঝিম করে। এই মুহূর্তে যেন মনে হচ্ছে ড্রাইভার আমাদের জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিস্থলে বসে হুইল ঘোরাচ্ছে। ওর হাতে সঁপে দিয়েছি আমাদের জীবন। এই সব রাস্তায় উঠতে এবং নামতে কার্য্যকরি ভূমকা গ্রহণ করেন গাড়ীর ব্রেক। ব্রেক ফেল হলে অনিবার্য্য জীবন ফেল।

বনাণীর ঘনত্ব যতই উপরে উঠছি ততই কমে আসছে বলে মনে হল। পাহাড়ের তরু শ্রেণী বেশীর ভাগ লম্বা হয়। অনুপাতে শাখা প্রশাখা কম। সমতল ভূমির তরু শ্রেণী বেঁটে অথচ গারে ভারী। অর্থাৎ শাখা প্রশাখার বিস্তার বেশী। যেখানে যেমন মানায়। মনে পড়ে সঞ্জিবচন্দ্রের মন্তব্য "বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" যেখানে যার প্রয়োজন, যাকে যেখানে মানায়। প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে দিয়েছেন তা। তবু নালিশের আমাদের অন্ত নেই। দিনে একবার সৃষ্টিকর্তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না পারলে পেটের ভাত হজম হয় না।

দীর্ঘ আরোহণের পরে অবশেষে আমাদের জীপ এসে দাঁড়াল হাওয়াই মহলের দ্বারে। এ জায়গাটাকে লাইব্রেরী বাজারও বলে। মুশৌরী শহরের সবচাইতে ব্যস্ত জায়গা। এখানে ফলের দোকান থেকে মদের দোকান। খাবারের দোকান থেকে ওষুধের দোকান। সবই রয়েছে। গেটের মুখে শিখেদের গুরুদোয়ার। ভেবেছিলাম মুশৌরীতে গরম জামার দরকার হবে। গরম নয়, তবে শীতও নয়। পাড়োয়ালী কুলিরা জানাল রাত্রে শীত পড়ে।

এটা জুন মাসের প্রথম দিক। অথচ হরিদ্বার, ঋষিকেশ, দেরাদুন অঞ্চলে বেশ ভাল গরম। দুপুরের প্রখর রৌদ্র কিরণে গায়ে বেশ তাপ লাগে। রাত্রের দিকে আরাম দায়ক। অথচ এখানকার লোকের মুখে শুনেছি শীতে দেরাদুন হরিদ্বারে বরফ পড়ে। জুনের দেরাদুন আর ডিসেম্বরের দেরাদুন আকাশ পাতাল পার্থক্য। সকলেই বলেন হরিদ্বার, ঋষিকেশ, দেরাদুন, মুশৌরী পাহাড়ের সিজেন টাইম মে, জুন। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্নতর। আরো আ.গ আসা উচিৎ। জুনের মাঝা মাঝি নেবে আসে বর্ষা। তবে মে মাসের আগে এলে কেদার বদ্রীর দরজা খোলা নাও পাওয়া যেতে পারে।

মাণিক জীপ থেকে নেমে বলল,

—চল, আগে পেটকে শান্ত করে নি। পরে চোখকে শান্ত করা যাবে?

আমি বললাম,

—৩টা চিরন্তন সত্য। পেট অশান্ত হয়ে উঠলে চোখ ও অশান্ত হয়ে উঠবে। চোখে সরষে ফুল দেখতে শুরু করব। অতএব চল, ঐ যে হোটেলটায় বাংলায় সাইনবোর্ড দেওয়া রয়েছে, ওটাতেই ঢুকে পড়ি।

হোটেলের ভিতরে ঢুকে দেখি বাংলা সাইনবোর্ডের আড়ালে হিন্দুস্থানীর মতের রান্না। মন্দ নয়। এ যেন ইংলিশ কাটিং কোট গায়ে ধুতি পরা বাঙালী সাহেব। যাকৃগে। ঢুকে যখন পড়েছি বেড়িয়ে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। খেতে বসে গেলাম। হরিদ্বার, ঋষিকেশ লছমন ঝুলায় যে তিনটি দ্রব্যের প্রবেশ নিষেধ, এখানে এবং দেরাদুনে তা নয়। ফলে যারা অধিক মাছ মাংস এবং ডিম ভোজী তারা হরিদ্বার ঋষিকেশের পরে দেরাদুন মুশৌরীতে চলে এলে সর্বাগ্রে উক্ত দ্রব্যগুলির দিকে নজর দেয়। জ্বরের পরে রুগীর প্রথম ভাত খাবার অবস্থা আর কি।

পাহাড়ের উপরে ছোট্ট শহর মুশৌরী। প্রধান আকর্ষণ স্থল এর লাইব্রেরী বাজার। এখানেই সকলে ভীড় জমায়। মুশৌরীতে মুশাফিরদের আনাগোনাই বেশী। মুশৌরীর রোপওয়ে এবং বাগান ও বহু লোকে দেখতে যায়। শুনলাম বিকেল ৫টার রোপওয়ে বন্ধ হয়ে যায়। লাইব্রেরী বাজার থেকে অনেকে ঘোড়ায় চড়ে ঘোরেন। অনেকটা দোলার মত চাকা হীন রিক্সায় যাত্রী নিয়ে গাড়োয়ালী কুলিরা কাঁধে করে ঘোরায়।

আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছে মুশৌরীর হাওয়াই মহলে দাঁড়িয়ে নীচের দৃশ্য উপভোগ করা। দূরে কুয়াশায় ঘেরা দেরাদুন উপত্যকা। মেঘের দল কখন বা উপর থেকে, কখনও বা পাহাড়ের বুক জুড়ে চলে যাচ্ছে দূরে। ওরা যাবে দেরাদুন, হরিদ্বার, সাহারানপুর ছাড়িয়ে আরো দূরে। ওরা এসেছে দেবলোক থেকে। তপোলোকের মাথা ঘুরে চলে যাবে নরলোকে। আমিও যাব তপোলোক দর্শন শেষে নরলোকে।

হাওয়াই মহলের রেলিং এ ভরদিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ওরা গেছে ঘোড়ায় চড়তে। পাশে দশ বারো জন লোক তাসের খেলায় মেতে উঠেছে। পয়সা পড়ছে ঝন্ ঝন্ করে। কেহ নিচ্ছে কেহ পকেটে পুরছে। মাঝে মাঝে বচসা হচ্ছে। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। যারা এক বেলার জন্যে দেখতে এসেছিল খুশৌরীকে এবারে তারা ফিরে যাচ্ছে।

একটু নীচে সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ফিরবে। আমরাও ফিরব অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই।

বিদায় সুন্দরী মুশৌরী। আবার আসবো কিনা জানিনা। তবে মনে থাকবে তোমার কথা ও যতদিন থাকবো পৃথিবীর পান্থশালায়। বাইরের চোখ দুটো হয়ত তোমায় দেখবে না। কিন্তু মনের মানষ পটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তুমি। শেষ বারের মত ভাল করে দেখে নিলাম সুন্দরী মুশৌরীকে। জীপ চলতে শুরু করল। এবার নামব নীচে অনেক নীচে। যেখানে দেরাদুন।

ট্রেন ছাড়তে আর খুব একটা বেশী দেরী নেই। স্টেশনে মানিক ব্যানার্জীবাবু এবং চৌধুরীবাবু এসেছেন আমায় তুলে দিতে। মানিকের কথা ছেড়ে দেই। ও আমার বাল্যবন্ধু। দীর্ঘদিন পরে উভয় উভয়কে পেয়েছি। অন্তরের টান থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ব্যানার্জীবাবু এবং চৌধুরীবাবু? তাদের সাথে তো মাত্র দুটো দিনের পরিচয়। হয়ত হতে পারে প্রবাসে মানুষ মানুষের কাছে এগিয়ে আসে দ্রুত। মুশৌরী দেরাদুন একই সাথে ঘুরেছি, বাহ্যিক শিষ্টাচার ভদ্রতা এক বস্তু। মনের টান কিন্তু আলাদা। ওটা মন থেকে উপলব্ধি করা যায়। ব্যানার্জীবাবু এবং চৌধুরীবাবুর ক্ষেত্রে আমি সেটা উপলব্ধি করেছি। আমার আসন্ন বিদায় ক্ষনে ওদের থমথমে মুখোভাব সেটা প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যানার্জীবাবু ধরা গলায় বললেন,

—এলেন, অথচ এত তাড়াহুড়ি চলে যাচ্ছেন, এটা আমার ভাল লাগছে না।

—আমারও কি লাগছে? কর্মের তাগিদে যেতে হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি চৌধুরী অন্যদিকে মুখ করে তাকিয়ে রয়েছেন। মানিক আমার হাতটাকে ওর হাতের মুঠির মধ্যে চেপে ধরে রেখেছে। অভিমানে ওর চোখ দুটো ছল ছল করছে। ও আমায় বার বার অনুরোধ করেছে অন্ততঃ একটা সপ্তাহ থেকে যেতে। কথা রাখতে পারিনি বলে চটে গেছে আমার উপর।

—একটা সপ্তাহ থাকলে তোর এমনি কি মহাভারত অশুদ্ধ হত।

—তুই বুঝতে পারছিস না। আমার অনেক জরুরী কাজ রয়েছে। না গেলে ক্ষতি হয়ে যাবে। তোর যখন খোজ পেয়েছি তখন আবার নিশ্চই আসবো! তা ছাড়া সময় পেলে তুই ও তো যেতে পারিস?

—দেখবো চেষ্টা করে।

মানিককে আমি চিনি। ও কথা খুব কম দেয়। দিলে তা রাখে। আসলে এটা ওর অভিমানের কথা। আমি আর ওকে ঘাটাই নি।

মানিক অভিমান হত কণ্ঠে বলল,

—গিয়ে একটা চিঠি দিতে সময় পাবি তো?

আমি হেসে ফেলে ছিলাম ওর ছেলেমানুষি দেখে।

আমি বললাম,

—পাব। তুই আবার অভিমান করে উত্তর দিস না।

আমার কথার উত্তর দিল না ও। শুধু একটু খানি ম্লান হাসল। আমি ওর দিকে আর তাকাতে পারলাম না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গাড়ী চলতে শুরু করেছে। মানিক তখন ও আমার হাত ওর মুঠির মধ্যে ধরে এগোচ্ছে। আমি বললাম,

—ছাড়। হাতটা ছাড়। আবার আসবো।

ও আমার হাত ছেড়ে দিল। আমি দুহাত জোর করে চৌধুরীবাবু এবং ব্যানার্জী-বাবুকে নমস্কার জানালাম। ওরাও হাত জোর করে আমায় প্রতিনমস্কার জানালেন। ওরা তিন জন দাঁড়িয়ে আছেন আমার দিকে তাকিয়ে। ট্রেন সরে যাচ্ছে ক্রমেই। অবশেষে চোখের আড়ালে চলে গেলেন ওরা।

বিদায় দেরাদুন।

বিদা' তপোভূমি।

নিয়ে গেলাম মনের মাঝের তোমাদের সুখ দুঃখের স্মৃতী। অঞ্জলী বিশ্বনাথ, দত্তবাবু, রায়বাবু, অঞ্জনা বৌদি, সীতা বৌদি, আশীষ, রূপ সিং, লছমী, মানিক, ব্যানার্জীবাবু, চৌধুরীবাবু। ভুলবো না তোমাদের। তোমাদের নিয়েই তো মহামানব জাত। এই মহামানব জাতককে জানাই আমার শ্রদ্ধা। লহ মোর কোটি নমস্কার।

ট্রেন চলেছে তপোলোক ছেড়ে নরলোকে। তপোভূমি ছেড়ে মর্তভূমিতে যেখানে আমার বেদনা-মধুর বসন্ত গুলি কেটেছে এবং কাটবে।